সৃজন

বার্ষিক পত্রিকা - ২০১৮

মানিকচক কলেজ

মথুরাপুর, মালদা

মানিকচক কলেজ

মথুরাপুর, মালদা - ৭৩২২০৩, পশ্চিমবঙ্গ

সৃজন

বার্ষিক পত্রিকা - ২০১৮

সৃজন
বার্ষিক পত্রিকা - ২০১৮
প্রকাশকাল - মে, ২০১৯

প্রকাশক ঃ
অধ্যক্ষ, মানিকচক কলেজ
মথুরাপুর, মালদা

@ মানিকচক কলেজ, মথুরাপুর, মালদা

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ঃ
গৌতম সরকার

মুদ্রক ঃ
অ্যাকিউরেসি
গৌড় রোড, মালদা
মোঃ - ৯৮৩২৩ ৯৩২০৬

সূ চি প ত্র

পৃষ্ঠা নং

আহ্বায়কের কলমে ৫

Administrative Body ৭
At a Glance ৮
Staff Details ৯
Teachers Activity ১০

কলেজের বিগত দিনের কর্মকান্ডের কিছু স্থিরচিত্র
শুভেচ্ছাবার্তা ১১ - ১৩

প্রবন্ধ

মানবজীবন ও ধর্ম ✦ সোমনাথ দাস ১৫
সোশ্যাল মাধ্যম ও ছাত্র সমাজ ✦ মোতালেব আলী ১৭
বর্তমান শিক্ষা প্রণালী ✦ সারদা পাল ১৮
বর্তমান সময়ে গান্ধীজির অহিংসা নীতির প্রাসঙ্গিকতা ✦ শুভশ্রী ঝা ২০
মধ্যযুগের ইতিহাসের প্রেক্ষিতে রাজমহল : একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা ✦ ড. প্রদীপ্ত আচার্য্য ২১
কড়ির ইতিহাস ✦ বিজন সরকার ২৩
নারীদের প্রতি হিংসাত্মক আচরণ ✦ অসীমা খাতুন ২৫
বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ : ভাষা ও সাহিত্যে বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ✦ সূর্যকান্ত সরকার ২৭
বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ : ভাষা ও সাহিত্যে শাক্ত পদাবলীর কবি কমলাকান্ত বিভাগ ✦ প্রীতি মণ্ডল ৩০
বাউল ও রবীন্দ্রনাথ ✦ বাপন মণ্ডল ৩২
আমার চোখে অন্নদামঙ্গল ✦ সাথী মণ্ডল ৩৫
শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য ও আধুনিক যুগে তার প্রভাব ✦ তুহিন শুভ্র মণ্ডল ৩৮

কবিতা ৪১- ৪৯

ধীরাজ মণ্ডল, ভাস্কর মণ্ডল, অসীমা খাতুন, প্রদ্যুৎ মণ্ডল, কণিকা মণ্ডল, ঊর্বশী মণ্ডল, নিরঞ্জনা দাস, তৃপ্তি মণ্ডল, লুৎফর রহমান, আসমাত নাদাপ, পুতুল প্রামাণিক, রিজিয়া সুলতানা, সুজিত ঘোষ, নুসরাত রহমান, চন্দ্রকান্ত সরকার, ঈশিকা সবনম, পায়েল পাণ্ডে

পৃষ্ঠা নং

পত্র সাহিত্য ৫০-৫২

ভাগ্যশ্রী মণ্ডল, আহসানূর খাতুন

গল্প

আত্মবিশ্বাস ✦ সেখ আত্তারুল ৫৩
হরিণ শিকার ✦ রাকেশ মণ্ডল ৫৫
অসহায় প্রেম ✦ নাওয়াজ সরিফ ৫৭

ESSAY

The More the Merrier : On The Importance of Reading Books Outside the Syllabus ✦ Debaditya Mukhopadhyay 59
Patriotism : An important Weapon to Develop a Nation ✦ Sujit Ghosh 61

POEM ..... 62 - 63

Abhijit Roy, Marium Khatun, Samima Khatun, Rumana Aktar

STORY

The Cruel Monster & The Villager's Story ✦ Sk. Saniul 64
Monsters in Everyday Life ✦ Shreyasi Singha 65
A Terrible Dream ✦ Mehrun Nesha 66
The Old Lady and A Doctor ✦ Indrani Mandal 67
A Fearful Night ✦ Mouli Karmakar 68
Movie Review : TUMBBAD ✦ Shreayasi Singha 69

Overall Activity 2018-19 70
Datasheet of Scholarships 2018-19 71
Facilities & Future Plan 72

QUOTES

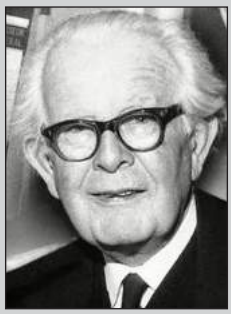

"The principle goal of education in the schools should be creating men and women who are capable of doing new things, not simply repeating what other generations have done."

- Jean Piaget

"A teacher can never truly teach unless he is still learning himself. A lamp can never light another lamp unless it continues to burn its own flame. The teacher who has come to the end of his subject, who has no living traffic with his knowledge but merely repeats his lesson to his students, can only load their minds, he cannot quicken them."

- Rabindranath Tagore

"Education is the manifestation of the perfection already in man."

- Swami Vivekananda

"True knowledge is not attained by thinking. It is what you are; it is what you become."

- Sri Aurobindo

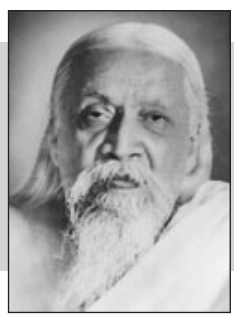

আত্মায়কের কলমে

কলেজ ম্যাগাজিন 'একজন শিল্পীর আত্মপ্রকাশের পথ' - এমন কথাকে আমরা একেবারে অস্বীকার করি না। হয়তো অনেকটা অগোছালো, অপরিপক্ক এবং খামখেয়ালীপনা থাকে। কিন্তু সেখানে লুকিয়ে থাকে একটা ছোটো লড়াই আর একটা ছেঁড়াফাটা স্বপ্ন। এই স্বপ্নই একদিন মহীরুহ হয়ে ছায়া দেবে না — এ কথাকে কেই বা অসত্য বলে প্রমাণ করবে।

এই অঞ্চলের প্রকৃতি, পরিবেশ, জীবন-জীবিকা ও নদ-নদী এখানকার বড় সম্পদ। চারিদিকে আমবাগানে ঘেরা রম্য জায়গা - এসব স্বপ্ন দেখার মতো। প্রতিদিনের নদীর পাড় ভাঙ্গার গল্প। মানুষে প্রকৃতিতে লড়াই। বেঁচে থাকার দারুণ প্রতিবন্ধকতা। ফুলহার নদীর চড়াই-উতরাই পাড়ের ওপারে ভূতনি গ্রাম। বাবলা গাছ যেখানে আমন্ত্রণ করে। বর্ষার জল আর কাদা এবং গ্রীষ্মে ধুলা সবসময়ের সঙ্গী। শহর নয় গ্রাম নয়। ভারতবর্ষের বাইরের কোন জায়গা বলে মনে হবে। সমস্ত কিছুর বাইরে যেন। শিক্ষা-স্বাস্থ্য ও যোগাযোগের অবস্থা বড়ই করুণ। এমন এলাকা থেকে যখন ছাত্রছাত্রীরা স্বপ্ন দেখে। তারা যদি কবিতা লেখে, গল্প লেখে, প্রবন্ধ লেখে - তাদের জীবনের - ক্ষতি কীসে? অবাক হই!! ব্যথিত হই!! যখন একজন ছাত্র এসে বলে - "স্যার গতবছর আমরা ধনী ছিলাম, এবার গরীব হয়ে গেছি।" "কেন রে?" উত্তর আসে - "স্যার, পঁয়ত্রিশ বিঘে জমি গঙ্গা খেয়ে নিয়েছে"।

ভালোবাসলে মানুষ নাকি খয়ে খয়ে যায়

ঠিক এখানে দাঁড়ালে
মানুষ ভাঙে - মরমর করে
এখানে শরীরটা জল হয়ে
উজান ডাকে।

ভালোবাসলে এক কুখ্যাত রাত
ধমনীর জরায়ু ছিঁড়ে
মানুষ পোড়া গন্ধ আসে

ভালোবাসলে মানুষ খয়ে যায় (স্বরচিত)

এদের বেশির ভাগ বাইরে যায়। যা কামাই করে আনে, তাতে কোনমতে চলে যায়। নিত্য দুর্ভিক্ষের জীবন। নিত্য লড়াই। বাঁচার লড়াই। মিলিকির রাস্তায় ঘাস বিক্রি করতে বসা, যখন কোন এক ঘাসিয়ার বলে - "আমার ছেলেটা এবার ভর্তি হয়েছে স্যার, দেখবেন যাতে পড়াশুনা ভালো করে।" তখন মনে হয় না, আমরা খারাপ কোন জায়গায় পড়াতে এসেছি। মনে হয় না, আমরা বিফলে যাচ্ছি। সব ঠিকঠাক। অন্তত এদের স্বপ্ন দেখাতে

পারি। এদের সাথে থেকে পাশে দাঁড়াতে পারি। এমন অবস্থায় যখন একটি সাধারণ কাগজ পত্রিকা হয়ে ওঠে। অনেক গল্প ও কবিতার এবং প্রবন্ধ ভরে ওঠে অক্ষরে অক্ষরে। তখন কারই না ভালো লাগে।

এখানকার মাটি এখানকার ভাষা সত্যি সাহিত্যের জন্য অনুকূল। এখানকার প্রকৃতি পরিবেশ কোন উপন্যাসের মুখ্য চরিত্র। বা একজনের চরিত্র কবিতা হয়ে উঠতে পারে। যদি সৃজনশীল দৃষ্টি থাকে। এইসব জীবন দেখিয়ে তাদের দিয়েই যদি লিখিয়ে নেয় 'সৃজন' তাতে এখানকার আঞ্চলিক ইতিহাস ভাষা ও সাহিত্য সমৃদ্ধ হবে। এখানেই তো গঙ্গা ফুলহারের চোখরাঙানি, নীলকুঠি, মানিকচক ঘাট, ওপারে তিনপাহাড়, মথুরাপুর হাট, চাঁই ভাষা ও খোট্টা ভাষা। আছে গোপালভোগ, ল্যাংরা, লক্ষণভোগ আর কত সুস্বাদু আম। এই এখানকার সম্পদ। এই এখানকার স্বপ্ন।

লিট্‌ল ম্যাগাজিনের পক্ষে নিয়মিত ছাপা এবং বিপুল ব্যয়ভার বহন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। সে কারণে লিট্‌ল ম্যাগাজিন মরে যায় নিত্য। এক্ষেত্রে আমাদের সমস্যা হওয়ার কথা নয়। আমরা এগিয়ে যাব, আমাদের স্বপ্নের সিঁড়ি বেয়ে।

আমাদের পত্রিকার সূচি মূলত কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে — ক) কবিতা, খ) গল্প, গ) প্রবন্ধ এবং ঘ) পত্র সাহিত্য।

এছাড়াও আছে মূল্যবান শুভেচ্ছা পত্র। পত্র নং - ১ গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং পত্র নং - ২ মানিকচক কলেজের অধ্যক্ষের পত্র। আছে স্টাফ ডিটেইল্‌স, টিচিং এক্টিভিটি এবং কলেজের বিভিন্ন কর্মের চিত্রমালা।

কৃতজ্ঞতার প্রথমেই জানাতে হয় আমাদের অধ্যক্ষ ড. অনিরুদ্ধ চক্রবর্তী মহাশয়ের কথা, তাঁর কর্মচাঞ্চল্য ও প্রখর বুদ্ধিদীপ্ততা সবসময়ই অনুপ্রেরণা যোগায়। যেকোন কঠিন কাজ তিনি সহজ করে দেন। তাঁর অভিভাবকত্ব আমাদের শক্তি দেয়। ধন্যবাদ আপনাকে। আমাদের কলেজ প্রশাসক এবং মালদা সদরের মহকুমা শাসক বরাবরই ইতিবাচক থেকেছেন ও আছেন। প্রশাসনের কাজ সামলেও আমাদের সময় দেন। তাঁকে ধন্যবাদ। ধন্যবাদ জানাই গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্যারকে, যিনি শুভেচ্ছা বার্তা পাঠিয়ে আমাদের কৃতজ্ঞ করেছেন। মানিকচক কলেজের সমস্ত অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, অশিক্ষকর্মী এবং সমস্ত প্রিয় ছাত্রছাত্রীদের ধন্যবাদ দিই, তারা সকলেই বিভিন্নভাবে বিভিন্ন সময়ে পত্রিকার সাথে যুক্ত থেকেছেন। সর্বশেষ ধন্যবাদ না দিয়ে পারা যায় না তাঁকে, যিনি টাইপ করে বাঁধাই করে সবার লেখা মলাটবন্দী করে গোটা পত্রিকা আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন, সুব্রত পাল কে।

ম্যাগাজিন কমিটির পক্ষে

গৌতম সরকার
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ও
আহ্বায়ক, ম্যাগাজিন কমিটি
মানিকচক কলেজ

ADMINISTRATIVE BODY

MANIKCHAK COLLEGE

Mathurapur, Malda

Sri Partha Chakraborty
Administrator & SDO, Malda Sadar

Dr. Anirudhha Chakraborty
Principal, Manikchak College

MANIKCHAK COLLEGE

AT A GLANCE

Name of College	:	**MANIKCHAK COLLEGE**
Year of Establishment	:	2014
Affiliating University	:	University of Gour Banga
Sanctioned Posts	:	Principal - 01 Teaching - l0 Non-Teaching - 5
Existing Status	:	Principal - 1 Teaching (Substantive) - 9 Guest Teacher - 11 Non-Teaching (Substantive) - 5 Contractual Non-Teaching - 6 Karmobandhu - 1 Sweeper - 1
Current Enrolment Status	:	lst Year - 2423 2nd Year - 1728 3rd Year - 949
Subjects Offered	:	Hons : Bengali (75), English (30), Sanskrit (25), History (40), Education (25), Political Science (25)
General	:	Bengali, English, Sankrit, History, Education, Political Science, Sociology, Philosophy
Total Library Books	:	3000 Approx.

MANIKCHAK COLLEGE

STAFF DETAILS

PRINCIPAL

Dr. Aniruddha Chakraborty
M.Sc (Chemistry), MA (Education), M.Ed., Ph.D. (Chemistry & Education)

SUBSTANTIVE TEACHING POST

Sri Somnath Das, MA, B.Ed.
Assistant Professor in Sanskrit
Dr. Diptoshree Som, MA, Ph.D.
Assistant Professor in Sanskrit
Dr. Pradipta Acharya, MA, Ph.D.
Assistant Professor in History
Sri Bijan Sarkar, MA, B.Ed.
Assistant Professor in History
Md. Masud Ali, MA, B.Ed., M. Phil.
Assistant Professor in English
Sri Debadity Mukhopadhyay, MA
Assistant Professor in English
Sri Goutam Sarkar, MA, M Phil
Assistant Professor in Bengali
Mrinmoyee Patra, MA, Ph.D.
Assistant Professor in Bengali

SUBSTANTIVE NON-TEACHING POST

Aktar Hossian, MA
Clerk
Dibakar Mandal, HS
Clerk
Hasina Begam, MP
Peon
Abhiram Mahaldar, HS
Peon
Amit Mahaldar, HS
Guard

GUEST FACULTY

Sri Nimai Chandra Paul, MA
Guest Teacher in Bengali
Sarada Pal, MA B.Ed.
Guest Teacher in Sanskrit

GUEST FACULTY

Ahasanur Khatun, MA, B.Ed.
Guest Teacher in Education
Shubhashree Jha, MA, B.Ed.
Guest Teacher in Philosophy
Farida Parvin, MA, B.Ed.
Guest Teacher in Sociology
Sujit Ghosh, MA
Guest Teacher in Education
Priyanka Paul, MA, B.Ed.
Guest Teacher in Education
Rajkumar Mandal, MA, B. Ed., M. Phil.
Guest Teacher in History
Motaleb Ali, MA, B.Ed., M Phil.
Guest Teacher in Political Science
Gita Rajbanshi, MA, B. Ed., M Phil.
Guest Teacher in Political Science
Rajkumar Saha, MA, M Phil.
Guest Teacher in Political Science

CONTRACTUAL NON-TEACHING POST

Md. Selim Akhtar, BCA, B.Ed.
Data Keeper
Dulal Ch. Mandal, B.Sc
Clerk
Parijat Misra, HS
Clerk
Soumitra Mandal, BA
Clerk
Santosh Mahaldar, HS
Peon
Afsar Hossain, VIII pass
Guard

MANIKCHAK COLLEGE

TEACHERS ACTIVITY

Sl. No.	Name	Designation	No. of Paper Presented in Seminars	No. of Workshop / Symposia Attended	Journal(s) Published	Book(s) Published	Invited Lectures
1	Somnath Das	Asst. Prof. in Sanskrit	4			2	
2	Diptasree Som	Sanskrit	1	2	1		
3	Pradipta Acharya	History	1	1	6		
4	Bijan Sarkar	History					
5	Md. Masud Ali	English	5				
6	Debditya Mukhopadhyay	English	9		5	2	
7	Goutam Sarkar	Bengali	31	5	2	6	3
8	Mrinmayee Patra	Bengali	2	1			
9	Ahasanur Khatun	Guest Teacher	2				
10	Nimai Chandra Paul	Guest Teacher	5			3	
11	Sarada Pal	Guest Teacher					
12	Subhasree Jha	Guest Teacher					
13	Priyanka Paul	Guest teacher	3				
14	Gita Rajbanshi	Guest Teacher	3		1	1	
15	Motleb Ali	Guest Teacher	8	1	1	2	
16	Rajkumar Saha	Guest Teacher	6	1		1	
17	Rajkumar Mandal	Guest Teacher					
18	Sujit Ghosh	Guest Teacher	1				
19	Farida Parvin	Guest Teacher	3				

বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অধ্যক্ষ বরণ

বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় শপথ গ্রহণ

বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে পতাকা উত্তোলন

উচ্চ লম্ফন ইভেন্টের একটি বিশেষ মুহূর্ত

এন সি সি ক্যাডারদের কুচকাওয়াজ

দৌড় প্রতিযোগিতার একটি বিশেষ মুহূর্ত

পুরুষ দৌড় প্রতিযোগিতার একটি বিশেষ মুহূর্ত

মহিলা দৌড় প্রতিযোগিতার একটি বিশেষ মুহূর্ত

এনএসএসের মহাবিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণ পরিস্কার কর্মসূচি

মহাবিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণ পরিস্কার কর্মসূচিতে ছাত্রছাত্রীরা

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর নববর্ষের বার্তা

কলেজের শিক্ষামূলক ভ্রমণ

এনএসএসের কর্মসূচি সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ

স্কলারশিপ শংসাপত্রসহ ছাত্রছাত্রীরা

শিক্ষামূলক ভ্রমণ

সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ কর্মসূচি পালন

নবীন বরণ উৎসব - ২০১৮

নবীন বরণ - ২০১৮ এর উদ্বোধনী সংগীত

নবীন বরণ - ২০১৮ এর প্রদীপ প্রজ্জ্বলন পর্ব

নবীন বরণ - ২০১৮ এর মঞ্চে উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

নবীন বরণ - ২০১৮ এর নৃত্যানুষ্ঠান

নবীন বরণ অনুষ্ঠানে সারেগামাপা খ্যাত ঋষি চক্রবর্তী

ঋষির সাথে তৃতীয় বর্ষের ছাত্র বাপনের সঙ্গীত পরিবেশন

ইংরেজী বিভাগের দেওয়াল পত্রিকা উদ্বোধন

ইংরেজী বিভাগের স্পেশাল ক্লাস

কেরিয়ার কাউন্সেলিং-এর শিকড়ের কথামালা অনুষ্ঠান

কেরিয়ার কাউন্সেলিং-এর আলোচনা সভা

বাংলা বিভাগের আন্তর্জাতিক আলোচনা সভা

কলেজের রাখি বন্ধন উৎসব

কলেজের ছাত্রছাত্রীরা

ইংরেজী বিভাগের দেওয়াল পত্রিকা উদ্বোধন

UNIVERSITY OF GOUR BANGA

Established under the West Bengal Act. XXVI of 2007
[Recognized U/S 2(f) & 12(B) of the UGC Act and NAAC accredited University with 'B' Grade (2016)]

Professor Swagata Sen
VICE CHANCELLOR

Phone & Fax : 03512-223666
URL : www.ugb.ac.in
Email : vc@ugb.ac.in

P.O. : Mokdumpur, Dist. : Malda, West Bengal - 732 103

Ref. No. 023/UGB/VC-19

MESSAGE

Date : 08.03.2019

At the first instance, I would like to express my salutation for the unceasing inspiring endeavours of the Manikchak College, Malda to enrich the knowledge society in the region for the last four years.

It is also very promising to note that the Manikchak College, Malda is going to publish its First College Magazine in the month of March 2019.

I take this opportunity to extend my greetings and felicitations to all the stakeholders contributed to the planning and execution of the occasion for their untiring endeavours and arduous effort which shall make this magazine a vivid one. I do believe such effort shall definitely enlighten the thoughts and feelings of the students.

I passionately wish the event a great success.

Once again, I thank all of you.

Professor Swagata Sen
Vice Chancellor,
University of Gour Banga, Malda

Vice-Chancellor
University of Gour Banga

MANIKCHAK COLLEGE

(Affiliated to the University of Gour Banga)
ESTD. : 2014
POST : MATHURAPUR, DIST. - MALDA, PIN - 732203
Website : www.manikchakcollege.com // e-mail : manichakcollege@gmail.com
Phone : 03513-28348

Ref. No..... *Date.....*

পত্রিকা হল প্রতিভা প্রকাশের মাধ্যম। এর মধ্য দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের সৃজনশীলতার বিকাশ হয়। সৃজনশীল চিন্তাভাবনা কালে কালে দেশের সম্মান বৃদ্ধি করে। সর্বোপরি মানুষ করে তোলে। আজকে যার ভীষণ অভাব - "যারা অন্ধ তারা চোখে বেশি দেখে আজ"।

বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় যেহেতু মানুষ গড়ার কারখানা, তাই আমরা এই দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারি না। পরবর্তীতে যাদের হাতে এই দেশ এই সমাজ চালিত হবে, তাদেরকে সুযোগ করে দেওয়াও আমাদের দায়িত্ব। সেই সলতে পাকার কাজ যদি শুরু করতে পারি — এটাই হবে আমাদের সাফল্য।

চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণতলে দিবশর্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি।

২০১৪ সালে প্রতিষ্ঠিত একটি কলেজ বিভিন্ন প্রতিকূলতা সামলে 'সৃজন' নামে কলেজের প্রথম বার্ষিক পত্রিকার প্রকাশ করতে চলেছে। ছাত্রছাত্রী থেকে অধ্যাপক অধ্যাপিকা সবাই কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ রচনার মধ্য দিয়ে পত্রিকার মলাটবন্দী হয়েছে। একটি গ্রামীণ কলেজের পরিকাঠামোর প্রত্যেকের উদ্যম সৃজনশীল চর্চাকে উদ্বুদ্ধ করেছে, আগ্রহী করেছে পঠন-পাঠনের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য মানসিক বৈশিষ্ট্যগুলির বিকাশ সাধনের। 'সৃজন' সেই সুযোগ করে দিয়েছে। আশা করি, ছাত্রছাত্রীরা সমৃদ্ধ হবে এবং আগামীতে সমৃদ্ধ করবে।

যারা পত্রিকা প্রকাশের সাথে যুক্ত সংশ্লিষ্ট সবাইকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

ধনবাদান্তে -

অধ্যক্ষ

মানবজীবন ও ধর্ম

সোমনাথ দাস
অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ

জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ জীব হল মানুষ। বর্তমানে মানুষ বিজ্ঞানবলে বলীয়ান হয়ে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয়ে চলেছে। নব নব আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে আমাদের হৃদয়ে বিস্ময়ের উদ্রেক করেছে। প্রযুক্তির বলে সমগ্র বিশ্বকে হাতের মুঠোয় নিয়ে এসেছে। এমনকি পৃথিবীর গণ্ডী অতিক্রম করে মহাকাশে পাড়ি দিয়েছে নতুনের খোঁজে। বিগত কয়েক বছরে ইন্টারনেট সারা বিশ্বের মানুষকে এক ছাতার তলায় নিয়ে এসেছে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের বিভিন্ন সংস্কৃতির, বিভিন্ন ভাষাভাষির মানুষের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে জাগরিত হচ্ছে বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ। তবে সম্প্রতি এই মহামিলনের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে কিছু অযাচিত সমস্যা। এই সমস্যাগুলির মধ্যে অন্যতম সমস্যা হল ধর্মীয় বিচ্ছিন্নতা। ধর্মকে কেন্দ্র করে সারা বিশ্বে সৃষ্টি হয়েছে অসহিষ্ণুতা, অবিশ্বাস ও বিচ্ছিন্নতার বাতাবরণ। ধর্মের দোহাই দিয়ে প্রসারিত হচ্ছে সন্ত্রাসবাদ। এক ধর্মের মানুষকে অন্য ধর্মের মানুষকে ঘৃণা করতে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

তবে মনে রাখতে হবে মানুষের জন্যই ধর্ম, ধর্মের জন্য মানুষ নয়। মানুষের থেকে ধর্ম বড় হতে পারে না। 'ধর্ম' শব্দটিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় 'ধৃ' ধাতুর সাথে মন্ প্রত্যয় করে 'ধর্ম' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। 'ধৃ'--ধাতুর অর্থ 'ধরে রাখা'। কাজেই ধর্ম শব্দের অর্থ যা মানুষকে ধরে রাখে, অর্থাৎ যা মানুষের মধ্যে মনুষত্বকে ধরে তাই-ই ধর্ম। মানুষের মধ্যে আদিম প্রবৃত্তি অর্থাৎ হিংসা, দ্বেষ, ঘৃণা প্রভৃতিকে দূর করে যা প্রেম ভালোবাসা শ্রদ্ধা ভক্তি বিনয় প্রভৃতি মানবিক গুণাবলী ধরে রাখে তাই ধর্ম। ধর্মের লক্ষণ মনুসংহিতায় বলা হয়েছে —

"দশলক্ষণকো ধর্মঃ সেবিতব্যঃ প্রযত্নতঃ।।
ধৃতিঃ ক্ষমা দমোহস্তেয় শৌচমিন্দিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্মলক্ষণম্।।"

অর্থাৎ ধৃতি (সন্তোষ), ক্ষমা (শক্তি থাকা সত্ত্বেও অপকারকারীর প্রতি অপকার না করা), দম (বিষয়সম্ভোগের মধ্যে থাকা সত্ত্বেও মনকে অবিকৃত রাখা), অস্তেয় (অন্যায়পূর্বক অপরের সম্পদ গ্রহণ না করা), শৌচ (দেহ ও মনের শুদ্ধি), ইন্দ্রিয়সংযম, ধী (সম্যক্ জ্ঞান লাভ), বিদ্যা (আত্মজ্ঞান), সত্য ও ক্রোধহীনতা। এই দশটিকে মনু ধর্মের লক্ষণ বলেছেন।

মূলতঃ সকল ধর্মই ভালোবাসার বাণী প্রচার করে। ঘৃণা, হিংসা প্রভৃতি পাশবিক প্রবৃত্তি থেকে নিরত থাকার উপদেশ দেয়। যখন পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব হয় তখন ধর্ম বলে কিছু ছিল না। মানুষ ছিল পশুতুল্য। বহু বিবর্তনের মধ্য দিয়ে উন্নততর মনুষ্যজাতিতে রূপান্তরিত হয়। পরবর্তীকালে মুনি ঋষিগণ মনুষ্যজীবনশৈলীর আরো উন্নতি সাধনের জন্য নানা উপদেশ দেন। এই সকল উপদেশ বাণীকে কেন্দ্র করে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন ধর্মের সৃষ্টি হয়। যেমন — গৌতমবুদ্ধের উপদেশবাণীর উপর ভিত্তি করে বৌদ্ধধর্ম, হজরত মহম্মদের উপদেশবাণীকে অবলম্বন করে ইসলাম ধর্ম, যিশুখ্রীষ্টের সদুপদেশকে ভিত্তি করে খ্রীষ্টধর্ম প্রভৃতি। তবে সকল ধর্মেরই উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন মানবতার

মধ্য দিয়ে ঈশ্বর প্রাপ্তি। তাই শ্রীরামকৃষ্ণদেব যথার্থই বলেছেন - 'যত মত তত পথ'। বিভিন্ন নদী ভিন্ন ভিন্ন এলাকার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হলেও তাদের গন্তব্য যেমন এক সমুদ্র অর্থাৎ সমুদ্রে পতিত হয়। তেমনি উপাসনাস্থল ও উপাসনা পদ্ধতি আলাদা হলেও প্রত্যেক ধর্মের মর্মবাণী এক। এই প্রসঙ্গেই গীতায় উক্ত হয়েছে —

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থঃ সর্বশঃ।।" ১১/৪

অর্থাৎ, 'হে পার্থ, যে আমাকে যেভাবে উপাসনা করে, আমি তাহাকে সেইভাবেই তুষ্ট করি। মনুষ্যগণ সর্বপ্রকারে আমাকে অনুসরণ করে অর্থাৎ মনুষ্যগণ যে পথই অনুসরণ করুক না কেন, সকল পথেই আমাতে পৌছাতে পারে'।

সাধারণত ধর্ম বলতে ঈশ্বর উপাসনা ও ঈশ্বরে সমর্পণকেই বোঝায়। তবে ব্যাপক অর্থে ধর্ম হল কর্তব্য। প্রত্যেকের নিজ নিজ দায়িত্ব কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করাই তার ধর্ম। একজন ছাত্রের ধর্ম বা কর্তব্য হল পড়াশুনা করা। শিক্ষকের কর্তব্য হল শিক্ষার্থীকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে যোগ্য নাগরিক গড়ে তোলা। চিকিৎসকের ধর্ম রোগীর সেবা করা। সন্তান হিসেবে আমাদের ধর্ম পিতামাতার সেবা করা। দেশের নাগরিক হিসেবে আমাদের কর্তব্য দেশমাতৃকার সেবা করা। যদি প্রত্যেকে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে তবে আলাদা করে ধর্মাচরণের প্রয়োজন নেই।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে যখন শত্রুপক্ষে নিজ আত্মীয়স্বজন দেখে অর্জুন যুদ্ধ করতে অস্বীকার করেন তখন শ্রীকৃষ্ণ বলেন — তুমি ক্ষত্রিয় যুদ্ধে শত্রুর নাশ করাই তোমার ধর্ম, অতএব তুমি যুদ্ধ কর। এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে —

"স্বধর্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি।
ধর্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাৎ-শ্রেয়োহন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে।।"
৩১ / ২

সমস্ত ধর্মের মূলধর্মগ্রন্থগুলি প্রায় দেড় থেকে তিন হাজার বৎসর পূর্বে রচিত। মানবকল্যাণে রচিত বিভিন্ন শাস্ত্রবিধি তৎকালীন সময়ে প্রাসঙ্গিক হলেও বর্তমানে তার সমস্তই সমানভাবে প্রাসঙ্গিক ও যুক্তিযুক্ত নাও হতে পারে। যেমন ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সময়ে যে সংবিধান রচিত হয়েছিল তা গত ৭০ বছরে শতবারেরও বেশিবার সংশোধিত হয়েছে সময় পরিস্থিতি ও গুরুতেবর উপর ভিত্তি করে। কাজেই বহু বৎসর পূর্বের কোন শাস্ত্রবিধি যদি বর্তমানে অবস্থা পরিবর্তনের ফলে সমাজরক্ষায় প্রতিকূল বোধ হয় তবে তা অবশ্যই ত্যজ্য। কেননা যুক্তিহীন গতানুগতিকভাবে শাস্ত্র অনুসরণ করলে ধর্মহানি হয়। এক্ষেত্রে উক্ত হয়েছে —

কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্তব্যে বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীন-বিচারেণ ধর্মহানি প্রজায়তে।।
-(বৃহস্পতি)

অন্যং তৃণমিব ত্যজমপ্যুক্তং পদ্মজন্মনা।
-(বশিষ্ঠ)

অর্থাৎ স্বয়ং ব্রহ্মাও যদি অযৌক্তিক কথা বলেন, তবে তাহা তৃণবৎ পরিত্যাগ করিবে।

কাজেই পরিশেষে বলা যেতে পারে সকল ধর্মেরই মূল প্রতিপাদ্য বিষয় মানবিকতা ও মোক্ষ লাভ। সকল ধর্মই অহিংসার কথা বলে, শান্তির কথা বলে, বিনয়ের কথা বলে। আমরা সকলেই অমৃতের সন্তান। মানুষে মানুষে কোন ভেদ নয়। কিছু স্বার্থন্বেষী মানুষ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য ধর্মের দোহাই দিয়ে মানুষের মধ্যে বিভেদের বীজ বপনের চেষ্টায় লিপ্ত, যা সমগ্র মানব জাতির ক্ষেত্রে ভয়ানক হতে পারে। তাই এক্ষেত্রে সমাজের শিক্ষিত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের এগিয়ে এসে ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ মানুষের সামনে তুলে ধরতে হবে, যাতে ধর্মের অপব্যাখ্যা করে ধর্মের ঠিকাদাররা মানুষের মধ্যে হিংসার বীজ ছড়াতে না পারে। সর্বধর্ম সমন্বয়ের মাধ্যমে মনুষ্যজীবনের সার্বিক বিকাশই হওয়া উচিত আমাদের লক্ষ্য।

সোশ্যাল মাধ্যম ও ছাত্র সমাজ

মোতালেব আলী
অতিথি অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

বিশ্বায়নের যুগে নির্বাক মানুষকেও বাকশক্তি দিয়েছে সোশ্যাল মাধ্যমগুলি - এ এক দারুণ ব্যাপার। এই একবিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীটা ছোট হতে হতে হাতের মুঠোয় চলে এসেছে। হাতের মুঠোয় বন্দি হয়েছে হোয়াট্সঅ্যাপ, ফেসবুক, ইনস্টাগ্রামের মতো অ্যাপ্স। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত চলছে স্টেটাস আপডেট করার বিষয়গুলি।

বর্তমান যুগের ছেলেমেয়েরা হঠাৎ করে কখনো কবি আবার কখনো সাহিত্যিক হয়ে উঠেছে, কখনো বা তাদের মধ্যে উঠছে প্রতিবাদের ঝড় — প্রভাবিত হচ্ছে সরকার। সত্যি কথা বলতে বর্তমান সমাজে নির্বাক ব্যক্তির পেট থেকে বেরিয়ে আসছে পাহাড় পরিমাণ মতামত। আর এই মতামতের প্ল্যাটফর্ম হয়ে উঠেছে বিভিন্ন সোশ্যাল মাধ্যমগুলি।

এই সোশ্যাল মাধ্যমগুলি শুধুই আর সামাজিক নেই, পরিণত হয়েছে এক রাজনৈতিক মাধ্যমে। ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, টুইটার-এর মাধ্যমে চলছে সরকারের বিভিন্ন প্রচার আর তৈরি হয়েছে এক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। এটি সাদা চোখে দেখা যায় না কারণ এটি নজরে আসে না। আর যা নজরে আসে না তা হল নিঃশব্দ প্রচার।

বর্তমান যুগে তৈরি হয়েছে এক নতুন অধ্যায়। এখানে জাতি, ধর্ম অনুযায়ী প্রচার চলে। এই অধ্যায়ে এক দল, আর এক দলকে ছোট দেখানোর চেষ্টা করে। এর থেকেই জন্ম নিয়েছে একটি নতুন শব্দ যার নাম ফেক নিউজ। এই ফেক নিউজ সোশ্যাল মাধ্যমগুলিতে ভয়ানক আকার ধারণ করেছে।

বর্তমানে এই সোশ্যাল মাধ্যমগুলি বৃহৎ ইন্ডাষ্ট্রিতে পরিণত হয়েছে। এই ইন্ডাষ্ট্রি এক অদ্ভুত মগজ ধোলাইয়ের মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে যারা স্মার্টফোন ব্যবহার করেন তাদের মধ্যে ৯০ শতাংশের বেশি মানুষ ফেসবুক, হোয়াট্সঅ্যাপ ব্যবহার করেন অনবরত। যদি আর একটু গভীরে গিয়ে দেখা যায় তাহলে সংখ্যাটির অধিকাংশেরই বয়স ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। এদের মধ্যে অনেকেই তাদের ভবিষ্যতে আলো দেখতে গিয়ে অন্ধকারে চলে গেছে। এরাই হলেন বর্তমান যুগের ছাত্র সমাজ।

বর্তমান শিক্ষা প্রণালী

সারদা পাল
অতিথি অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ

আমাদের দৃশ্যমান জগৎ একান্ত ক্ষণস্থায়ী। চিরন্তন অবিনশ্বর সত্য হল ব্রহ্ম বা ঈশ্বর। আত্মবিকাশ ও আত্মোপলব্ধির মধ্য দিয়ে সেই পরম সত্ত্বাকে জানাই হলো মানব জীবনের প্রধান লক্ষ্য। তাই সকল শিক্ষার শেষ কথা "আত্মানং বিদ্ধি" বা নিজেকে জানা। তাই প্রাচীন ঋষিরা মনে করতেন বিদ্যা হলো সেই বস্তু যা মানুষকে সবরকম জড়া, ব্যাধি, দাসত্ব, নীচতা থেকে মুক্ত করে, তাই বলা হল "সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে"।

শিক্ষার বাস্তবিক অর্থ হলো কোন কিছু শিখে নিজেকে পূর্ণ তৈরি করা, তাই স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন — 'Education is the manifestation of Perfection Present already in man. Divinity is the manifestation of the religion already in man. শিক্ষা হলো মানুষের অন্তর্নিহিত সত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে বোঝা যায় — শিক্ষা হলো মনুষ্য জীবনের চক্ষু স্বরূপ, সেই চক্ষু বা মানুষকে যথার্থযোগ্য মানুষ তৈরি করে, ভালোমন্দ, উচিত-অনুচিত ইত্যাদি নানাদিক বুঝতে সহায়তা করে। শিক্ষা কর্মদক্ষতার নৈপুণ্য প্রকাশ করে সুপ্তশক্তির জাগরণ ঘটিয়ে নিজের জীবনের সাথে সাথে রাষ্ট্র জীবনের প্রগতির পথ প্রশস্ত করতে সহায়তা করে।

কিন্তু আজকের বিদ্যার্থী এই সমস্ত দিকের বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হয়েছে? শিক্ষা প্রণালীর যে নিময় চালু আছে তাতে যথার্থ নাগরিক গঠন করতে সক্ষম হয়েছে? উত্তর নিশ্চিত রূপে 'না'। স্বাধীনতার এত বছর পরেও শিক্ষার এত ব্যাপক বিস্তার সত্ত্বেও এই দেশ ব্যক্তি সাক্ষরের বেশী কিছু হতে পারেনি। শিক্ষার্থী নিজেকে সুশিক্ষিত তো দূরের কথা সামান্য স্তরের শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার দাবী করতে পারে না। এর কারণ হলো, অতীতকালের কেরানী ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রাখা। ইংরেজরা দেশ চালানোর জন্য পুঁথিগত শিক্ষিত করে কিছু কেরানী তৈরি করেছিল। সেই পদ্ধতিটিকে আজও আমরা ঐতিহ্যবাহী হিসাবে বহন করে আসছি। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন — "শিক্ষাকে বহন নয় বাহন করিতে হইবে"।

গান্ধীজী এরূপ পুঁথিগত শিক্ষার কুপ্রভাব অনেক আগেই অনুভব করেছিলেন, তাই তিনি বুনিয়াদী শিক্ষার কথা বলেছিলেন। বুনিয়াদী শিক্ষা হলো সেই শিক্ষা যা মানুষকে অক্ষর জ্ঞানের সাথে সাথে কর্মোপযোগী করে তোলে। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা লাখ লাখ পঙ্গু মানুষ তৈরি করছে। দুঃখের বিষয় — একবিংশ শতাব্দীতে পা দিয়েও শিক্ষার অবনতি বৈ উন্নতি হলো না। অন্যান্য দেশের সাথে তাল মিলাতে গিয়ে শিক্ষণ প্রণালীতে পাশ ফেল তুলে শিক্ষিতের হার বাড়ছে, কিন্তু যথার্থ শিক্ষিত হতে পারছে কি? উত্তর নিশ্চিতরূপে না। বর্তমানে অধিকাংশ সংখ্যক শিক্ষার্থী মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেও আক্ষরিক অর্থ বুঝতে পারে না। অথচ আজ থেকে ২০-৩০ বছর আগে মাধ্যমিক শিক্ষার্থী যেকোন বাংলা সুস্পষ্টভাবে পড়তে পারত। তাহলে শিক্ষার উন্নতি কিভাবে ঘটল?

আমার বিচারে বর্তমান শিক্ষণ প্রণালী শিক্ষিত হওয়ার ভ্রম তৈরি করে নির্জীব মেশিন তৈরি করছে যা উৎপাদনের নামে প্রতি বছর লাখ লাখ দিশাহীন পঙ্গু যুবক-যুবতী তৈরি করছে। তাই বি.এ., এম.এ. পাশ

করেও বিদ্যার্থী সরকারী কেরাণী হতে না পেরে জীবনের সমস্ত সক্রিয়তা হারিয়ে পরিশ্রান্ত ও পরাজিত অনুভব করতে থাকে। তাই শিক্ষিত বিদ্যার্থী নিজেকেই তো গঠন করতে সক্ষম হয়নি, সে দেশ জাতি তথা সমাজের উন্নতি কিভাবে করবে? কিভাবে দেশকে অগ্রগতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে?

"যারে তুমি নীচে ফেল সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে,
পশ্চাতে রাখিছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।"

যুব সমাজের পরাজয়ের সাথে সাথে আমাদের দেশের ক্রমোন্নতি থমকে পরাজয়ের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। ভাবছি, ইন্টারনেটের যুগে আমরা যুগোপযোগী হয়ে গেছি, কিন্তু না, বর্তমান যুব সমাজ ভালো দিকটা পরিত্যাগ করে খারাপ দিকটাই গ্রহণ করছে। যুব সমাজ এর কু-প্রভাবের শিকার হচ্ছে। এর কারণ হলো যথার্থ শিক্ষার অভাব। বর্তমান শিক্ষা প্রণালী শিক্ষিত হওয়ার বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছে, কিন্তু বাস্তবিক যোগ্যতা তথা ব্যবহারিকতা সামান্যতম স্পর্শ করতে পারে না। বিদ্যার্থী নিজের ব্যক্তিত্ব হারিয়ে বেকারত্বের অসহনীয় জ্বালা বুকে নিয়ে সারাজীবন কষ্ট পেতে থাকে। তাই আত্মবোধ, দেশবোধ, রাষ্ট্রবোধ এবং মানবীয়তাবোধ পেতে যে শিক্ষা সহায়তা করে না, এরূপ শিক্ষণ প্রণালীর পরিবর্তন অবশ্যই প্রয়োজন। একথা সত্য শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তনের রব বার বার উঠে আসে, কিন্তু জানি না কেন কলুর বলদের মতো সেই অতীতকালের কেরানী ভিত্তিক শিক্ষা প্রালী আজও আমরা বহন করেই যাচ্ছি? এর প্রকৃত কারণ হলো — একই ছাঁচে ভিন্ন ভিন্ন মাটির দ্বারা পুতুল নির্মাণের মতো। ছাঁচ একই কিন্তু সেই ছাঁচের উপর পলি, দোঁয়াশ ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন মাটির পুতুল তৈরির মতো শিক্ষণ প্রণালীতে ছাপরূপ মূল কাঠামোর পরিবর্তন না করে ভিন্ন ভিন্ন মাটির ন্যায় শুধু বিষয়ভিত্তিক ও নম্বর ভিত্তিক পরিবর্তন করা হচ্ছে। কিন্তু কেরানী তৈরি করার সেই ঐতিহ্যবাহী পদ্ধতি কোন না কোনভাবে থেকেই যাচ্ছে। এরূপ নির্জীব শিক্ষা প্রণালী সুশিক্ষার জড়কে সমূলে ধ্বংস করে ফেলছে। যে শিক্ষা ব্যক্তি জীবনের সফলতা আনে না এরূপ শিক্ষা প্রণালীর পরিবর্তন অবশ্যই কাম্য। তাই APJ Abdul Kalam এর কণ্ঠে সরবে ঘোষিত হয়েছে — "Education is the most powerful weapon which you can use to change the world." অর্থাৎ শিক্ষা এমন এক শক্তিশালী অস্ত্র যার যথার্থ ব্যবহারে পৃথিবীও পরিবর্তন হতে পারে। এই পরিবর্তন প্রসঙ্গেই Malala Yousazai বলেছেন,"One child, One teacher, one pen and one book can change the world".

অতএব বর্তমান শিক্ষা প্রণালী এমন হওয়া উচিত, যা হবে বিদ্যার্থীর রুচিসম্মত ও জীবনোপযোগী। শিক্ষা বিদ্যার্থীকে নির্জীব যন্ত্র নয়, সজীব কর্মোপযোগী করে তুলবে। বিদ্যার্থী শিক্ষাকে ব্যবহারিক জীবনে কাজে লাগাতে সক্ষম হবে। দেশে থাকবে না এত বেকার সমস্যা। বি.এ., এম.এ. পাশ শিক্ষিত বিদ্যার্থী বেকারত্বের জ্বালা থেকে মুক্তি পেয়ে জীবনকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলবে। অক্ষর জ্ঞানের সাথে সাথে কর্মদক্ষতায় নৈপুণ্য অর্জন করবে। শিক্ষার্থী নিজের জীবনের উন্নতির সাথে সাথে দেশ জাতি তথা সমাজের উন্নতিতে এগিয়ে আসবে। অর্থাৎ যুব সমাজের উন্নতিতে এগিয়ে আসবে। অর্থাৎ যুব সমাজের ক্ষন্নতিই তো দেশের প্রকৃত সাফল্য। সর্বোপরি বলা যায়, শিক্ষা প্রণালীর সামান্যতম পরিবর্তন দেশকে তথা সমাজকে ভয়াবহ বিপদ থেকে রক্ষা করে অগ্রগতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। প্রসঙ্গ ক্রমে গান্ধীজীর কথা মনে পড়ে যায় — "By education, I mean an all round drawing out of the best in child and man body, mind and spirit" অর্থাৎ ব্যক্তির দেহ, মন ও আত্মার সুষম বিকাশের প্রয়াসই হলো শিক্ষা।

বর্তমান সময়ে গান্ধীজির অহিংসা নীতির প্রাসঙ্গিকতা

শুভশ্রী ঝা
অতিথি অধ্যাপিকা, দর্শন বিভাগ

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী তাঁর জীবনে প্রধানত দুটি নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন — সত্য ও অহিংসা। ভারতবর্ষ সেই সময়ে গান্ধীজি অহিংসা নীতিতত্ত্বেই বিশ্বাসী ছিলেন। গান্ধীজি তাঁর অনুগামীদের অহিংসা নীতিতে দীক্ষিত হতে বলেন। কেননা, সহিংস পথে কখনও কল্যাণ সাধন সম্ভব নয়, কল্যাণ সাধনের জন্য অস্ত্র ছেড়ে সম্পূর্ণ অহিংস পথেই অগ্রসর হতে হবে। এই সময় ডান্ডি অভিযান, সত্যাগ্রহ এক অন্যতম নিদর্শন।

গান্ধীজির সত্য ও অহিংস এই দুটি নীতিতত্ত্ব বর্তমান সময়ে যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক। সত্য ও অহিংসা একে অপরের পরিপূরক। অহিংস পথ অবলম্বন করতে হলে সত্যের পথে অবিচল থাকতে হবে। গান্ধীজি বিশ্বাস করতেন, হিংসার পথে শত্রুকে দমন করা যায় না। অহিংস পথে চালিত করে সমাজের মঙ্গল সাধন সম্ভব। কিন্তু বর্তমানে আমরা গান্ধীজির অমৃতবাণী ভুলতে বসেছি। আমরা যদি প্রাত্যহিক জীবনের দিকে আলোকপাত করি তাহলে দেখতে পাব, দৈনন্দিন আমরা ছোট ছোট বিষয় নিয়ে হিংসা, হানাহানিতে লিপ্ত হই। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে হিংসা এতটাই বেড়ে গেছে আমরা দেখতে পাই দাঙ্গা, হানাহানি, কপটতা ও ভ্রষ্টাচার। এই ভ্রষ্টাচার ও কপটতা থেকে মুক্তি পেতে হলে অহিংস পথেই দুষ্টের বিবেকবুদ্ধির কাছে আবেদন জানিয়ে তার হৃদয় পরিবর্তন করতে হবে। কেননা, হিংসার দ্বারা সমাজের উন্নতি সাধন সম্ভব নয়। যেখানে হিংসা থাকবে সেখানে সত্য থাকবে না।

বর্তমান যুগে গান্ধীজির অহিংস নীতি ও আদর্শের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। গান্ধীজির এই আদর্শকে আমাদের নিজেদের মধ্যে প্রয়োগ করতে হবে এবং সমাজকে যদি সেই নীতির দ্বারা পরিচালিত করা যায় তাহলে হিংসা, হানাহানি সমস্ত কিছুই লুপ্ত হয়ে যাবে। সমাজকে কলুষমুক্ত করতে হলে সর্বপ্রম নিজেকে সেই নীতির দ্বারা পরিচালিত হতে হবে, তবেই সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে এই নীতির প্রতিফলন ঘটানো যাবে। আমরা প্রায়শ দেখে থাকি, এরাই পরিবারের বা সম্প্রদায়ের মধ্যে কিছু পরিমাণ সম্পত্তি বা অর্থ নিয়ে মতানৈক্য বা বিভেদ সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে আলোচনার মাধ্যমে যদি সমস্যার সমাধান করতে অগ্রসর হই তাহলে মানুষের মধ্যে হিংসা বন্ধ হবে এবং সৌভ্রাতৃত্ববোধ জেগে উঠবে। সুতরাং সকলকে প্রেম, ভালোবাসার মাধ্যমে সত্যের পথে পরিচালিত করলে সেখানেই অহিংস নীতির সার্থকতা।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীর মানবতার যে উদার অভ্যুদয় ঘটেছিল গান্ধীজির মধ্যেই প্রত্যক্ষ করা গেছে তার চরমতম অভিব্যক্তি। বর্তমান পৃথিবীতে গান্ধীজি তাই প্রেম, সত্য ও অহিংসার এক উজ্জ্বলতম প্রতীক, এক মহান অবতার পুরুষ। গান্ধীজির বাণী সত্য ও অহিংসার বাণী, মানবতার বাণী। মানবপ্রেম ও সত্যানুরাগ তাঁকে বিশ্বের অন্যতম সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষের সম্মানে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

মধ্যযুগের ইতিহাসের প্রেক্ষিতে রাজমহল :
একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা

ড. প্রদীপ্ত আচার্য্য
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ

বর্তমান ঝাড়খণ্ডের সাহেবগঞ্জ জেলার অন্তর্গত রাজমহল গঙ্গার তীরে অবস্থিত এক ছোটো ধরনের গঞ্জ। বর্তমানে এটি ছোটো হলেও অতীতে বিশেষত সুলতানী যুগের শেষের দিকে ও মুঘল যুগের সূচনায়ও বেশ কিছু সময় পরেও রাজমহল ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য শহর হিসাবে পরিচিত ছিল।

গঙ্গার তীরে অবস্থিত হওয়ার কারণে ও পাশাপাশি সাহেবগঞ্জ তিন পাহাড় ও বর্তমানে ঝাড়খণ্ডের কিছু ছোটো ছোটো পাহাড় থাকার কারণে প্রাকৃতিক দিক থেকে যথেষ্ট বলা না গেলেও মোটামুটি সুরক্ষিত ছিল বলা যেতেই পারে। গঙ্গার তীরে থাকায় এর নাব্যতা ছিল যথেষ্ট ও সেজন্য বরাবরই এটি বাণিজ্য কেন্দ্র হিসেবে সুপরিচিত ছিল। এখান থেকে জলপথে গঙ্গার নীচু দিকে গেলে বর্তমান ফারাক্কা হয়ে খুব সহজেই পদ্মা ধরে বাংলাদেশে ঢোকা যায়, আবার রাজমহল ঘাট থেকে খেয়া পাড়াপাড় করে মানিকচক ঘাটে এসে মানিকচক থেকেও সামসী হয়ে একদিকে নেপাল সীমান্তে ও অন্যদিকে বর্তমান দিনাজপুর হয়ে বাংলাদেশে খুব সহজেই ঢোকা যায়। যেহেতু আমাদের পাসপোর্ট-ভিসার ব্যাপার আছে তাই এটা আধুনিক সময়ে একটু দুঃসাধ্য হলেও আমাদের আলোচ্য সময়কাল অর্থাৎ সুলতানী যুগ বা মুঘল যুগে এমন কি ভারত স্বাধীন হবার আগে পর্যন্ত এই পথে পরিবহন চলত।

রাজমহলের ঐতিহাসিক গুরুত্ব সুলতানী যুগের শেষ লগ্ন থেকেই শুরু হয়েছিল। বলা চলে করনানী বংশের ঊষালগ্ন থেকেই রাজমহল বাঙলার ইতিহাসের পাদপ্রদীপে চলে আসে। রাজমহলের নামকরণ নিয়েও বিতর্ক আছে। কেউ কেউ বলেন যে রাজমহল রাজাদের মহল দ্বারা বেষ্টিত ছিল বলে এই নামকরণ আবার ইতিহাসের বহু জায়গাতেই রাজমহলের নাম আগমহল পাওয়া যায়।

সুলতানী যুগে গৌড় ও মুঘলদের সময়কালের একদম গোড়ার দিকে উঠে আসা তাণ্ডার (বর্তমান বিহারে অবস্থিত) থেকে রাজমহলের আবহাওয়া ছিল মনোরম ও স্বাস্থ্যের পক্ষে উপযোগী। তাই দেখা যায় যে, বাঙলায় করনানী বংশের সময়কালে রাজমহল তার গুরুত্ব অর্জন করতে থাকে। ১৫৬৪ খ্রী. কররানী বংশের সূচনা হয় তাজখান করনানীর হাত ধরে এবং এই বংশই হল বাঙলার শেষ সুলতানী বংশ। তিনি গৌড়ের পাশাপাশি বর্তমান পূর্ববঙ্গের সোনার গাঁওতে রাজধানী স্থাপন করেন। তারপরে সুলেমান করনানী ১৫৬৪ খ্রী. তাঁর রাজধানী তান্ডাতে নিয়ে আসেন। তিনি উড়িষ্যাকে বাংলার অন্তর্ভুক্ত করেন। মুঘলদের সাথে তিনি সুসম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন। কিন্তু করনানী বংশের শেষ শাসক দাউদ খান কররানীর সাথে মুঘলদের সম্পর্কের অবনতি হলে ১৫৭৬ খ্রী. ২৫শে সেপ্টেম্বর মুঘল সেনাপতি মুনিম খান কররানীদের রাজধানী তান্ডা দখল করেন। দাউদ এই সময় পিছু হটেন ও উড়িষ্যা অঞ্চলের দিকে সরে যান। ১৫৭৫ খ্রী. মার্চ মাসে তুকারোই এর যুদ্ধে দাউদ পুনরায় মুনিম খানের হাতে পরাজিত হন ও বাংলা, বিহার মুঘলদের ছেড়ে দেন কটকের সন্ধির দ্বারা। তবে এই সময় ১৫৭৫ খ্রী. অক্টোবর মাসে ৮০ বছর বয়সে মুনিম খানের মৃত্যু হলে সেই সুযোগে দাউদ পুনরায় বালা দখল করেন ও নিজেকে স্বাধীন

বলে ঘোষণা করেন এবং রাজমহল অঞ্চলে আশ্রয় নেন কারণ আগেই বলেছি রাজমহল ছিল পাহাড় ও নদী দ্বারা সুরক্ষিত।

তবে মুঘল শাসক আকবর দাউদ খানের এই দাম্ভিকতাকে দমন করার জন্য খনা জাহানকে পাঠান ও তিনি ১৫৭৬ খ্রী. ১২ই জুলাই রাজমহলের যুদ্ধে দাউদকে পরাজিত ও হত্যা করেন এবং রাজমহল সহ বাংলার বিভিন্ন অংশ দখল করেন (পূর্ববঙ্গ ছাড়া)। পূর্ববঙ্গকে দখলে আনতে বেশ কিছু সময় লেগেছিল, সে আলোচনা এখানে করার নয়।

যাই হোক, মুঘল সেনাপতি মানসিংহ রাজমহলকে কেন্দ্র করে বাঙলায় মুঘলদের প্রথম রাজধানী গড়ে তোলার সাথে সাথেই রাজমহলের নগরায়নের সূচনা হয়। আকবরের নামানুযায়ী রাজমহলের নাম হয় 'আকবর নগর'। মানসিংহের সময়কালে রাজমহলে মসজিদ, বারোদুয়ারী, রাজার প্যালেস, দেওয়ান-ই-আম, দেওয়ান-ই-খাস ইত্যাদি গড়ে উঠতে থাকে। রাজমহলে মসজিদের পাশে এক পুরনো শিবমন্দির আছে সেটাকে বলা হয় যে রানী যোধাবাঈ-এর পূজা অর্চনার জন্য তৈরি করা হয়েছিল। এখান থেকে আকবরের ধর্মীয় সহিষ্ণুতারও নিদর্শন পাওয়া যায়।

এখানে মানসিংহের সময়কালেই টাঁকশাল তৈরি হয় ও আকবরের নামে সিলভার কয়েন ছাপা হতে থাকে ও খুব অল্প কয়েকটা স্বর্ণমুদ্রাও ছাপা হয়। রাজমহল মিন্ট বা টাঁকশাল থেকে বহু বছর যাবৎ মুঘল মুদ্রা ছাপা হয়েছিল। ১৬০৮ খ্রী. আবুল ফজলের বাবা আব্দুল লতিফ যখন রাজমহলে আসেন তখন তিনিও মানসিংহ দ্বারা নির্মিত সুদৃশ্য রাজপ্রাসাদগুলির প্রশংসা করেনে। ইংরেজরাও তাদের বিবরণে রাজমহলের প্রশংসা করেছেন।

এখানে ডাচ্, ফরাসী ও ইংরেজ বণিকরা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যেও এসেছিলেন। তেভারনিয়ারের বিবরণ থেকেও জানা যায় যে রাজমহল শহর হিসাবে যথেষ্ঠ নজর কেড়েছিল। ১৬৭০ খ্রী. জন মার্শাল যখন রাজমহল শহরে ভ্রমণ করতে আসেন তখনও রাজমহল শহর হিসেবে বেশ জনপ্রিয় ছিল। মানরিকের বিবরণ থেকে জানা যায় যে তিনি যে সময় এসেছিলেন তখন রাজমহল অঞ্চলে গঙ্গার বক্ষে প্রায় ছোট বড় মিলিয়ে ১ হাজার বাণিজ্য জাহাজ যাতায়াত করতো। এমন কি অনেক সময় জাহাজ নোঙর করার মতন জায়গা পাওয়াও দুষ্কর হয়ে দাঁড়াতো। এই সমস্ত বিবরণ থেকে একথা সহজেই অনুমেয় যে আজ আমরা যে রাজমহল শহরকে দেখি মুঘল আমলে দীর্ঘ দুশো বছর তা ছিল বাংলার অর্থনীতি ও বাণিজ্যের এক অন্যতম প্রাণকেন্দ্র স্বরূপ।

অর্থনৈতিক আলোচনার ক্ষেত্রে একটা কথা এখানে না জানালেই নয়, রাজমহল থেকে বর্তমানে মঙ্গলহাট যাওয়ার পথে ডানদিকে গঙ্গার তীরে জগত শেঠের মিন্ট নামক এক বাড়ীর ভগ্নাবশেষ চোখে পড়ে। ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, এখানে মুঘল আমলের অন্যতম বণিক তথা ধনকুবের জগত শেঠ টাঁকশালকে কিনে নিয়েছিল অথবা নিজের একটা বড় অংশ দায়িত্ব ছিল এবং এই বাড়িটি অনেকটাই আধুনিক যুগের ব্যাঙ্কের মতন কাজ করতো। এই মুঘল টাঁকশাল থেকে ঔরঙ্গজেবের থেকে ঔরঙ্গজেবের সময় পর্যন্ত প্রায় ২০০ বছর কিছুটা সময়ের অন্তর ছাড়া মুদ্রা উৎকীর্ণ করা হয়েছিল এবং মুর্শিদকুলী খাঁ যখন মুর্শিদাবাদে মুঘল টাঁকশাল স্থাপন করেন তখন ধীরে ধীরে রাজমহল টাঁকশাল তার গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে।

এইভাবে বহু অজানা ইতিহাসের এককালে স্বাক্ষ্যবহনকারী এই রাজমহল শহর মুর্শিদকুলীর সময়কালেও তারপর থেকেই তার গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে। বিশেষ করে ইংরেজরা যখন বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতাতে নিয়ে যায় তখনই এই শহরের পতন সম্পূর্ণ হয়। রাজমহল সম্বন্ধে এই ছোট্ট তথ্য ইতিহাসের নিরিখে হয়তো এক ক্ষুদ্র কণা মাত্র, কিন্তু আশা রাখি এই তথ্য অনেককেই সমৃদ্ধ করবে।

কড়ির ইতিহাস

বিজন সরকার
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ

পৃথিবীর যাবতীয় দ্রব্যধনের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি সংখ্যক দেশে যা ব্যবহৃত হবার দাবী করতে পারে তা হল কড়ি। তবে কড়ির ব্যবহার সবচেয়ে বেশি ভারতবর্ষে। প্রাচীনকাল থেকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে জিনিস (খুচরো) কেনাবেচার জন্য কড়ি ব্যবহার করা হত। এই "কড়ি" শব্দটি এসেছে হিন্দি শব্দ "কৌড়ি" থেকে। আবার সংস্কৃত শব্দ "কপর্দক" শব্দটি থেকে "কড়ি" কথাটির উৎপত্তি। তার বহু উল্লেখ আছে ভারতীয় সাহিত্যে ও লেখামালায়। বাংলায় "কড়ি" নিয়ে বহু প্রবাদ রয়েছে, 'গাটের কড়ি', 'হিসাবের কড়ি বাঘে খায় না' প্রভৃতি। এই সকল প্রবাদ প্রমাণ করে যে একসময় বাংলার সমাজ ও অর্থনীতিতে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে কড়ির বিশেষ ভূমিকা ছিল। অথচ আজ তার কোন মূল্য নেই। কড়ির উৎপত্তি প্রকৃতি থেকে, এটি মানুষের তৈরি নয়। জনৈক বিশেষজ্ঞ কড়ি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে লিখেছেন, "The original occupant of this solid, shiny, slightly asymmetrical shell with its narrow ventral opening was a gasteroped mollusc living in shallow water and preferring that water to be warm, hence its distribution in the Indian and pacific oceans." (A. H. Quiggin, A survey of primitive money, The Beginnings of Currency, p. - 26)

কড়ি সাধারণত কয়েকটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে পাওয়া যেত। এদের মধ্যে মালদ্বীপ এবং প্রশান্ত মহাসাগরের কিছু দ্বীপপুঞ্জ রয়েছে। কড়ির মধ্যে প্রকারভেদ আছে। যেমন Cypraea moneta, Cypraea annulus ইত্যাদি। কাজেই প্রাচীনকালে কড়ি ব্যবহারে অভ্যস্ত কোন অঞ্চলে সবপ্রকারের কড়ির বাজারদর এক নাও হতে পারে। অলঙ্কার, তাবিজ বা কোনও আচারের জন্য কড়ি ব্যবহৃত হলেও বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহারের জন্য এর নিজস্ব যোগ্যতা আছে। কড়ি আকরে ছোট, সহজেই এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যাওয়া যেত। বাংলায় কড়ি মালদ্বীপ থেকে নিয়ে আসা হত চালের বিনিময়ে। তবে তা কবে থেকে নিয়ে আসা শুরু হল তার তথ্য নির্ভর ইতিহাস এখনো আমাদের অজানা। একইভাবে অজানা কখন এবং কিভাবে বাংলায় প্রচলিত মুদ্রার সবচেয়ে নিচু ধাপের সহযোগী মুদ্রা হিসেবে কড়ির প্রচলন হয়েছিল।

আমাদের দেশে কড়ির ব্যবহার সুপ্রাচীন। মৌর্যযুগে সরকারী কর্মচারী ও কারিগরদের বেতন দেওয়া হত কড়ির হিসেবে। খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকের শেষ বৎসরে অথবা পঞ্চম শতকের প্রথম দশকে চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন লক্ষ করেছিলেন যে ভারতবর্ষের মধ্য দেশ অঞ্চলের "লোকেরা জিনিসপত্র কেনাবেচার জন্য কড়ির ব্যবহার করত।" (ফো-কুড-কি, ২৬নং অধ্যায়)। নীহারঞ্জন রায় তাঁর 'বাঙালির ইতিহাস' আদিপর্বে লিখেছেন, গুপ্তযুগ থেকে বাংলাদেশে মুদ্রার নিম্নতম মান ছিল কড়ি। অ্যাংলো-ভারতীয় শব্দ

সংগ্রহের অভিধান হবসন জবসন (১৮৮৬)-এর মতে উনিশ শতকের প্রায় শেষ পর্যন্ত বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে সীমিত আকারে কড়ির প্রচলন টিকে ছিল। ঐতিহাসিক মিনহাজউদ্দিন বলেছেন, বিজয়ী তুর্কিরা বাংলাদেশের কোথাও রৌপ্য মুদ্রার প্রচলন দেখতে পাননি, খুচরা কেনাবেচার জন্য কড়িই ব্যবহৃত হতো। পনের শতকে সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহর সময়ে গৌড়ে ভ্রমণকারী চীনা রাজদূত মা হুয়ান লিখেছেন, এখানে রূপার মুদ্রা চালু ছিল, তবে খুচরা কেনাবেচার জন্য কড়ির ব্যবহার হতো। ১৭৫০ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ বণিকেরা দেখেছেন শহরে কর আদায় হতো কড়ি দিয়ে।

কে. এম. মহসীন-এ বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট ইন ট্রানজিশন : মুর্শিদাবাদ ১৭৬৫-১৭৯৩, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল দেখিয়েছেন ধাতব মুদ্রার সঙ্গে কড়ি কিভাবে পেড়ে উঠেছিল — "কড়ি ধাতব মুদ্রার মতো সহজে ক্ষয়ে যায় না, ধাতব মুদ্রায় সহজেই ভেজাল দেওয়া যায়, কড়ির ক্ষেত্রে এসব সম্ভব নয়। সব ধাতব মুদ্রাকেই জাল বা নকল করা সম্ভব, কড়ির ক্ষেত্রে সে সুযোগ নেই।" কড়ির মূল যোগানদার মালদ্বীপ। সেখান থেকে কড়ি এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপে রপ্তানী হত। আরব বণিক সোলায়মান (৮৫১ খ্রি.) মালদ্বীপের কড়ি সংগ্রহের একটি সাশ্রয়ী এবং স্বল্প শ্রমের পদ্ধতি আবিষ্কারের কাহিনি শুনিয়েছেন। মালদ্বীপের অগভীর সমুদ্র উপকূলে নারকেলের পাতাসহ ডাল জলে ডুবিয়ে রাখলে জীবন্ত সামুদ্রিক কড়ি ঝাঁকে ঝাঁকে সেই ডালে আশ্রয় নেয়। কিছুদিন পর কড়িসহ সেই ডাল ডাঙায় তুলে রোদে ফেলে রাখা হয়। এরপর মৃত কড়ির দেহাবশেষ পচে গেলে শুধু এর শক্ত খোলস পড়ে থাকে। এই চকচকে শক্ত খোলসটিই ধুয়ে পরিষ্কার করে কড়ি হিসেবে নানা দেশে রপ্তানী করা হয়। ইবন বতুতা দেখিয়েছেন, চালের বিনিময়ে বাংলায় কড়ি রপ্তানী হত। আবুল ফজল দেখিয়েছেন মুঘল আমলে কোনো কোনো অঞ্চলে কড়ির মাধ্যমে খাজনা আদায় হত। কোম্পানীর শাসনের প্রথম দিকে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে খাজনা আদায় হতো কড়ির মাধ্যমে বাংলায় ১৭৫০ খ্রি. থেকে। খাজনা আদায় হতো রূপার টাকার পরিমাণে কড়ি দিয়ে। ১টি রূপোর টাকা ছিল ৫১২০টি কড়ির সমান। তাহলে কারোও খাজনা ১০ টাকা বছরে হলে কড়ি দিতে হতো ৫১,২০০টি। এই বিপুল সংখ্যক কড়ি রাখার জন্য শহরে অনেক গুদাম ছিল। এক বিরাট নৌবহরের সাহায্যে এই কড়ি প্রতি বছর ঢাকায় পাঠানো হতো। লিন্ডসে সাহেব লিখেছেন, 'সুখের বিষয় যে, এই প্রথা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই, সত্ত্বরই তা উঠিয়ে দেওয়া হয়।' কড়ির বিকল্প হিসেবে ইংরেজরা তামার পয়সা চালু করেন। ১৮০৭ সালে ইংরেজ কোম্পানী এক আইন জারি করে যে সকল অঞ্চলে কড়ির মাধ্যমে খাজনা আদায় হতো তা পুরোপুরি বন্ধ করে দেয়। এরপরই কড়ির চাহিদা কমে গিয়ে দ্রুত দাম পড়তে শুরু করে। তবে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে কড়ির ব্যবহার পুরোপুরি উঠে যায় তা বলা খুবই কঠিন।

বর্তমানে কড়ি বিয়েতে, পুজোতে এবং ধনের দেবী লক্ষ্মীর ঝাঁপির গায়ে আটকে রাখতে দেখা যায়। বিয়েতে কড়ি দিয়ে খেলা হয়, যা 'কড়ি খেলা' নামে পরিচিত। গ্রামগঞ্জে নারায়ণ পুজোতে কড়ি ব্যবহার করা হয়। এককথায় কড়ি বর্তমানে মাঙ্গলিক কাজে ব্যবহার করা হয়। তবে এই বিপুল সংখ্যক কড়ির ব্যবহার বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর, তার প্রভাব গ্রামবাংলার অর্থনীতিতে কতটা পড়েছিল আর সেই কড়িই বা কোথায় গেল সেসব প্রশ্ন আজও আমাদের অজানাই রয়ে গেছে।

নারীদের প্রতি হিংসাত্মক আচরণ

অসীমা খাতুন
প্রথম বর্ষ, সাধারণ

সাম্প্রতিককালে যে সমস্যাটি নারীদের সবচেয়ে প্রবল, তা হল তাদের প্রতি বিভিন্ন হিংসামূলক ও অনিষ্টকর আচরণ। গৃহে, কর্মক্ষেত্রে, রাস্তাঘাটে প্রায় প্রতিটি বিচরণ ক্ষেত্রে নারী আজ বিভিন্নভাবে অপমানিতা, লাঞ্ছিতা, নির্যাতিতা। রাস্তায় কোন অশ্লীল মন্তব্য হজম করা থেকে শুরু করে ধর্ষণ, খুন পর্যন্ত ঘটনাগুলি প্রতিদিনের সংবাদপত্রে থাকবেই। এ যেন রোজকার স্বাভাবিক ঘটনা। নারীদের প্রতি অশিষ্ট ও হিংসামূলক আচরণ বিভিন্ন ভাবে আছে। এগুলি হল — ইভটিজিৎ, পরিবারের মধ্যে ও বাইরের যৌন নিগ্রহ, প্রহার, অপহরণ, শ্লীলতাহানি, ধর্ষণ, হত্যা প্রভৃতি। নারীর প্রতি এ জাতীয় ঘটনা অগণিত এবং অনেক ঘটনাই আমাদের গোচরে আসে না। নারীর শরীরের প্রতি পুরুষের খুব স্বাভাবিক আকর্ষণ (যা জৈবিক নিয়ম) — এর সাথে বিকৃত মানসিকতা, লাম্পট্য ও অসহায়ের ওপর বীরত্ব প্রদর্শনের অস্বাভাবিক ইচ্ছা প্রভৃতি যোগ হয়ে যে অদ্ভুত কু-প্রবৃত্তির জন্ম হয়, তার ফসল উপরিউক্ত ঘটনাগুলি। আইন আছে, আইনের রক্ষাকর্তাও আছেন, তবুও এ জাতীয় ঘটনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। আইন, প্রশাসন, সচেতনতা এগুলি সমাজের সর্বস্তরে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষমতা, এই দেশ, এই সমাজ এখনো অর্জন করেনি। তাই হয়তো নারী নির্যাতনের, লাঞ্ছনার, ধর্ষণের, অপহরণের, খুনের হাজারো ঘটনার কবর পেয়েও "আমরা নির্লিপ্ত বসে থাকি, আমাদের পিঠে কোনো চেতনার চাবুক পড়ে না।"

তবে অতি সাম্প্রতিক সময়ে বেশ কিছু ঘটনা আমাদের হৃদয়ে সাড়া ফেলেছে। পার্ক স্ট্রিট কাণ্ড থেকে, দিল্লি গণধর্ষণ, বারাসত কাণ্ড থেকে মুম্বইতে সাংবাদিক ধর্ষণের ঘটনায় দেশ জুড়ে প্রতিবাদ- প্রতিরোধের ঝড় উঠেছে।

মূল্যায়নঃ

বৈদিক সভ্যতার মাঝামাঝি বা শেষার্ধের তুলনায় বর্তমানের ভারতবর্ষে নারীজাতির মর্যাদাগত অবস্থান আকাশ-পাতাল পার্থক্য সূচিত করে। "সমাজের অনেক বদল হয়েছে।" মর্যাদাগত এই পরিবর্তনের ফলে আজকের নারীসমাজকে আর দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক বলে কটাক্ষ শুনতে হয় না। পরিবারে এখন অনেক নারীরা স্বাধীনতা ভোগ করেন। তাদের অনেককে আর নিষেধের ঘেরাটোপে বন্দিনী হয়ে থাকতে হয় না। পারিবারিক কোনো বিষয়ে পুরুষদের সাথে সাথে তারাও মতামত দিতে পারেন। পারিবারিক অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে তারাও স্বামীর সাথে কর্মক্ষেত্রের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন। অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কারকে বিসর্জন দিয়ে তারা হয়েছেন যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞানমনস্ক। নিজেদের সামর্থ্য ও যোগ্যতায় তারা আজ যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী। পড়ে পড়ে মার খাওয়ার দিন শেষ, অন্যায় অত্যাচার হলে তারাও প্রতিবাদী স্বরে

গর্জে ওঠেন। একদিকে কর্মক্ষেত্রে আত্মমর্যাদা, আত্মবিশ্বাস, স্বাতন্ত্র্য, দায়িত্বশীলতা ও গাম্ভীর্য নিয়ে চলতে পারেন, আবার বাড়ি ফিরে উজার করে দিতে পারেন শ্রদ্ধা-ভালোবাসা -স্নেহ-মমতা তা কখনো শ্বশুর-শাশুড়ির প্রতি, কখনো স্বামীর প্রতি, কখনো সন্তানের প্রতি। হয়তো বা এ জাতীয় বৈচিত্র্যময় ভূমিকা পালনের ক্ষমতা তারা লাভ করেছেন কিছুটা মুক্তির মধ্য দিয়ে। এই জাতীয় মুক্তি একদিনে আসেনি। অনেক বালিকাকে সতী হতে হয়েছে, তবে সতীদাহ বন্ধ হয়েছে। এভাবেই দেওয়ালে পিঠ ঠেকতে ঠেকতে তারা ঘুরে দাঁড়িয়েছেন। দীর্ঘকাল ধরে সংগ্রাম করতে করতে তারা তাদের ন্যায্য দাবী আদায় করেছেন, পেয়েছেন সম্মানাধিকার। এই সাফল্য হয়তো প্রমাণ করে —

"মেয়েরা হাত-পা, মস্তিষ্ক সহ সম্পূর্ণ মানুষ। তাদের অকেজো করে রাখার অধিকার কোনোও মানুষের নেই, প্রতিষ্ঠানের নেই, রাষ্ট্রের নেই।"

অনেক হয়েছে, অনেক হয়নি। সমাজের মাটি থেকে পিতৃতন্ত্রের মহিরূহকে সম্পূর্ণ উপরে ফেলা যায়নি বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুরুষের প্রাধান্য ও কর্তৃত্ব এখনও সুপ্রতিষ্ঠিত। নারী সমাজের একটি বড়ো অংশ এদের হাত থেকে মুক্তি নয়। এদের চারপাশ এক 'অদৃশ্য শেকল' যাকে আইন, প্রশাসন, এমনকি নারীরাও ভাঙতে পারেন না। এখনও কোনো পরিবারে নারীকে তার জন্য 'মাপা গণ্ডি'তেই ঘোরাফেরা করতে হয়। পুরুষের অনুমতি ব্যতীত হাটে-বাজারে যাওয়া, আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধবদের বাড়ি যাওয়া হয় না। এখনও অনেক স্বামী তার স্ত্রীতে প্রতিনিয়ত শারীরিক নির্যাতন করে থাকেন, তা হয়তো পণের কারণে বা নিজের স্ত্রীর ওপর অধিকার ঠিক রাখার জন্য বা নিছকই আনন্দ পাওয়ার জন্য। এখনও সতীদাহ হয় — তবে তা ঘরের মধ্যে গায়ে কেরোসিন দিয়ে স্বামী-শ্বশুর-দেওরের দ্বারা। কিছুদিন আগেই আমাদের দেশের এক রাজনৈতিক নেতা তার স্ত্রীকে কুমিরের সামনে ফেলে পৌরুষত্বের প্রমাণ দিয়েছিলেন। এ তো গেল পারিবারিক জগতের কথা। পরিবারের বাইরে নারীরা কি খুব ভালো আছেন? এখনও সন্ধ্যের আগেই কোনো মেয়েকে বাড়ির নিরাপদ আশ্রয়ে ঢুকে যেতে হয় 'নষ্ট' হওয়ার ভয়ে। কোনো কারণে সন্ধে হয়ে গেলে কোনো সহৃদয় কাকা-জ্যেঠা-দাদাকে খুঁজতে হয় নিরাপদে বাড়ি পৌঁছে দেবার জন্য। প্রকাশ্য দিবালোকে রাস্তায় চলতে চলতে পাড়ার দাদাদের অশ্লীল মন্তব্য হজম করতে হয়। চোখে মুখে, কথাবার্তায় প্রতিবাদ প্রকাশ পেলেই অ্যাসিড বাল্বের আশঙ্কায় বাড়ি থেকে বের হওয়া বন্ধ হয়ে যায়। স্কুল ফেরৎ ছোটো মেয়েরা হঠাৎই উধাও হয়ে যায় — পুলিশ উদ্ধার করে আনে মুম্বইয়ের পতিতাপল্লী থেকে — এ সবের পরেও কি মনে হয় যথেষ্ট নারী স্বাধীনতার প্রসার হয়েছে, নারীমুক্তি ঘটেছে?

অনেক মার তার মেয়ে, অনেক ভাই তার দিদি, অনেক দিদি তার ভাইকে হারাবেন, তবুও "এই অবস্থায় নারীকে তার প্রাপ্য অধিকার পেতে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে সম্মুখ সমরে। এছাড়া মুক্তি নেই। 'মুক্তি' কেউ হাতে ধরিয়ে দেবে না, মুক্তিকে খুঁজে বার করতে হবে সকল বাধার পাহাড় ডিঙিয়ে।" না হলে হয়তো সাম্প্রতিককালের এক লেখিকার আক্ষেপ — " তবে কি এই-ই সত্য যে নারীর না মরে মুক্তি নেই?" ভাবাবে আমাদের।

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ :
ভাষা ও সাহিত্যে বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

সূর্যকান্ত সরকার
তৃতীয় বর্ষ, বাংলা বিভাগ

সারসংক্ষেপ :
আদি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের একমাত্র শ্রেষ্ঠ নিদর্শন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'। পুঁথিটি ১৯০৯ খ্রি. পণ্ডিত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় বাঁকুড়া জেলার বনবিষ্ণুপুরের নিকটবর্তী কাকিল্য গ্রামের শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ির গোয়াল ঘরের মাচা থেকে আবিষ্কার করেন। তারপর ১৯১৬ খ্রি। পুঁথিটি কলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে প্রকাশিত হয়। বইটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্য-সমাজে অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। আজ শতবর্ষের আলোকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সম্বন্ধে কিছু সংক্ষিপ্ত বিষয় উপস্থাপন করতে চলেছি।

বইটির 'মুখবন্ধ' লিখলেন আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, 'লিপিকাল' রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পুঁথিটির সকল বিষয়ে ভূমিকা লিখলেন সম্পাদক বসন্তরঞ্জন রায় নিজে। এছাড়া হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, প্রমথ চৌধুরী, সুকুমার সেন প্রমুখ অসংখ্য পণ্ডিত এ বিষয়ে আলোচনা সমালোচনায় মনোনিবেশ করলেন।
তুলোট কাগজে লেখা পুঁথির প্রতিটি পৃষ্ঠায় ৭টি করে লাইন আছে। মোট ৩ রকমের লিপি এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। মোট ১৩টি খণ্ডে বিভক্ত পঞ্চদশ শতাব্দীর শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে বড়ু চণ্ডীদাস শিল্পনিপুণতায় কাব্য সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছেন। সাগর-পদুমার কন্যা রাধা ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাহিনিকে মাধুর্যমণ্ডিত করার জন্য কবি যেমন পৌরাণিক কাহিনির সমন্বয় ঘটিয়েছেন তেমনি লৌকিক কাহিনির সমাবেশও ঘটিয়েছেন। লোকভাষা ও লোক কাহিনি নির্মাণে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। গ্রাম্য বালিকা রাধার কাছে কৃষ্ণ যখন মহাদান চেয়ে বসে তখন রাধা বলে ওঠে আমি উঁচু বংশের বউ, উঁচু স্বভাব আমার। আমি কারো জমির কাঁচা আলে পা দিই না। এ একান্তই লৌকিক কথা। নৌকাখণ্ডে রাধাকে পাবার আশায় কৃষ্ণ যখন হিরা হিরা বলে দাঁড় টানে — হে হে লহে লহে বলে গান গায় — তা ইতর লোকের গান। এই সমাজচিত্র গ্রামীণ জীবনে আজও প্রায়ই দেখা যায় — এতে কোনো সন্দেহ নেই। বড়ু চণ্ডীদাস পঞ্চদশ শতাব্দীর শ্রী কৃষ্ণকীর্তন কাব্যে চরিত্র নির্মাণেও একবিংশ শতাব্দীর সমাজজীবনকে তুলে ধরেছেন। প্রতিটি চরিত্রই যে বাস্তব চরিত্র — রক্ত মাংসের মানুষ তা বলাই বাহুল্য। পূর্ণ বিকশিত নারীদেহ যে সৌন্দর্য নিয়ে পুরুষের চিত্তে আগুন ধরিয়ে দেয়, বড়ু চণ্ডীদাস তাকেই রূপ

দিয়েছেন তাঁর মানসী প্রতিমা তিলোত্তমা রাধা চরিত্রে। নানান ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে তার দেহ মনের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, ঘৃণা-অবজ্ঞা, আবেগ-আকুতি, প্রেম বঞ্চনা নিয়ে পূর্ণ বিকশিত চরিত্রে বিকশিত হয় রাধা তার চমৎকার সৃজন।

আবার কাব্যের নায়ক শ্রীকৃষ্ণচরিত্রে তেমন কোনো চমৎকৃতি নেই। সে চরিত্রের ক্রমবিকাশও ঘটেনি। তবে কবির যে প্রধান লক্ষ্য কৃষ্ণ এবং শ্রোতাদের তিনি যে কৃষ্ণে প্রতি মনোনিবেশ করাতে চান তা তিনি কাব্যের প্রথম খণ্ডেই বোঝাতে চেয়েছেন। বড়ু চণ্ডীদাস যেহেতু জীবন্ত মানুষের কবি তাই পাপপুণ্য-ধর্মাধর্ম, উচিত-অনুচিত সামাজিক কর্তব্যবোধকে কৃষ্ণ চরিত্রে মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট করতে চেয়েছেন। আর বড়ায়ি যে সবচেয়ে সক্রিয় চরিত্র — সে সখী, দূতী ও অভিভাবিকা — এতে কোনো সন্দেহ নেই।

সাহিত্য যেহেতু সমাজের দর্পণ — তাই কবি চান বা না চান, তার সাহিত্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সামাজিক চিন্তা-চেতনার পাশাপাশি সমকালীন সমাজজীবনের অতি সুন্দর ছবি ফুটে ওঠাই যথার্থ। সমাজে যারা বসবাস করে, সমাজের যেসব জিনিস আমরা দেখি সাধারণত তারই প্রতিফলন সাহিত্যে পড়ে। পঞ্চদশ শতাব্দীর শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের সমাজ একেবারে লৌকিক দরিদ্র গোপপল্লীর সমাজ, সেখানকার দৈনন্দিন জীবনের প্রেক্ষাতে সেই সমাজ অবিকল উঠে এসেছে — যা একবিংশ শতাব্দীর সকল মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেকালের মানুষের নানা বৃত্তি অনুসারে নানা রকম জাতি গড়ে উঠেছিল। যেমন — গোপ জাতি, নাপিত, কুমোর, মাঝি, স্বর্ণকার, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈদ্য, শূদ্র ইত্যাদি। নারী-পুরুষেরা বিচিত্র অলংকার ও বেশভূষা ব্যবহার করতে পছন্দ করতেন। তবে খাদ্যদ্রব্যের বিশেষ কোন উল্লেখ ছিল না। প্রায় সর্বত্রই দুধ-দই-ঘোল — এই তিনটি জিনিসের উল্লেখ পাওয়া যায়।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন যেহেতু মধ্যযুগের কাব্য — তাই মধ্যযুগীয় নানা সংস্কার বিশ্বাসে কাব্যটি পূর্ণ। বিবাহ বা প্রণয় ঘটিত ব্যাপারে পান-সুপারি পাঠানোর ব্যবস্থা এখনো প্রচলিত আছে। আবার নানা সামাজিক কুসংস্কার আজও সমাজ জীবনে বিদ্যমান — হাঁচি, টিকটিকি, কাকের ডাক, শূন্য কলসী ইত্যাদি। সেকালের মানুষের চণ্ডীপূজার বিশেষ চল ছিল । কৃষ্ণকে পাবার জন্য বাড়ায়ি রাধাকে চণ্ডীপুজা করতে বলেছে। তাছাড়া কবি সর্বত্রই বাশুলীর কথা বলেছেন। কবি তার সেবক ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে স্বর্গ-নরক, পাপ-পুণ্যেরও উল্লেখ আছে। সেকালের মানুষের মতো আজকের মানুষেরাও বিশ্বাস করে থাকে — পুণ্যকর্মে লোকে স্বর্গে যায়, নানা সুখ ভোগ করে। পাপ কালে মানুষ নরকে যায় — বিষময় ফল ভোগ করে। শতাধিক ব্রাহ্মণ বা গরু মারার থেকেও স্ত্রী বধ যে আর অধিক পাপ - তা সকলেই বিশ্বাস করত। আর সেই সুযোগে নারীরাও আত্মহত্যার ভয় দেখিয়ে পুরুষদের বিচলিত করার চেষ্টা করত। এছাড়া পারিবারিক ও সামাজিক অনুশাসনের পরিচয়ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে পাওয়া যায়।

মধ্যযুগীয় বাংলাদেশের সামাজিক দলিল হিসাবে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে কবি অক্ষরবৃত্ত ছন্দের চমৎকার প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। পয়ার, ত্রিপদী, মহাপয়ার, চৌপদী, একাবলীর বহুল ব্যবহারে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন শতবর্ষ পরেও তার স্বমহিমায়

বিরাজমান। ছন্দ-নির্মাণের পাশাপাশি অলংকার প্রবাদ-প্রবচন নির্মাণেও কবির কৃতিত্ব প্রশংসনীয়। পুঁথি প্রকাশের পর থেকে পণ্ডিতেরা বইটি সম্পর্কে নিজ নিজ মন্তব্য প্রকাশ করতে থাকেন। কেউ বলে আখ্যান কাব্য, কেউ বা মহাকাব্য, কেউ নাট্যকাব্য, আবার কেউ নাট্যগীতি পাঞ্চালী। তবে শ্রকৃষ্ণকীর্তন কাব্য নিঃসন্দেহে নাট্যে লক্ষণাক্রান্ত আখ্যানকাব্য। নাট্যগুণ ও কাব্যগুণের বিচিত্র সমন্বয় ঘটেছে এ কাব্যে। নাট্যগীতি পাঞ্চালী রূপেই এই গল্পের সার্থকতা স্বীকৃত। এছাড়া শ্রীকৃষ্ণকীর্তন শৃঙ্গার রসের কাব্য কিন্তু হাস্যরস উপেক্ষিত হয়নি। তিনি প্রথম সচেতনভাবে কাব্যে হাস্যরসাত্মক দৃশ্য মুক্ত করে তার কাব্য কথাকে অধিকতর উপভোগ্য করে তুলেছেন।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে নিসর্গ প্রকৃতির বাহ্যরূপ ও অন্তর্শক্তি দুই-ই প্রকাশিত হয়েছে। সেই নিসর্গ প্রকৃতি কখনও কবি কম্পনাজাত এক পরিপূর্ণ রবীন্দ্রনাথের মতো কবি মনের প্রকৃতি-প্রীতি জাগরিত না হলেও বড়ু চণ্ডীদাসের নিজস্ব কাব্যসত্তাই সেখানে ফুটে উঠেছে। আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন - বর্ষার এই চারটি মাস কৃষ্ণ বিরহিত রাধা কি নিদারুণ যন্ত্রণাময় বিরহপতিত হয়ে দিন কাটালো কবি তার যে অনুপম চিত্র অঙ্কন করেছেন — তাই রাধার চতুর্মাস্যা। যা বাংলা সাহিত্যের অভিনব সৃষ্টি বলাই যায়।

শতবর্ষ পরে মধ্যযুগের এই শ্রেষ্ঠ নিদর্শন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' আজও স্বমহিমায় বিরাজমান। যার খ্যাতি শুধু বাংলা সাহিত্যে নয় — সমগ্র সাহিত্যের ইতিহাসে অভিনব সৃষ্টি।

গ্রন্থপঞ্জিঃ

ক) চৌধুরী কামিল্যা, মিহির। মার্চ, ২০১৩। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' বড়ু চণ্ডীদাস বিরচিত। শিলালিপি। কলকাতা - ৭০০০০৯।

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ :
ভাষা ও সাহিত্যে শাক্ত পদাবলীর কবি কমলাকান্ত বিভাগ

প্রীতি মণ্ডল
তৃতীয় বর্ষ, বাংলা বিভাগ

সারসংক্ষেপ :
বাংলার শাক্ত পদ সাহিত্যের একজন উল্লেযোগ্য কবি কমলাকান্ত ভট্টাচার্য। তাঁর রচিত আগমনী পর্যায়ের আলোচ্য পদটিতে অলৌকিক, দৈবী ভাবের পরিবর্তে মানবীর ভাবের প্রকাশ ঘটেছে। গিরিরাজ হিমালয়-কন্যা উমাকে নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন এ সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুলকিত উমা পাগলিনীর মত ধাবিত হয়েছেন। চলতে চলতে তাঁর চুল খুলে পড়েছে। উমাকে দেখে মেনকা তাকে সাথে সাথে জড়িয়ে ধরে মুখ চুম্বন করতে শুরু করেছেন। কবি কমলাকান্তের গৌরীর সুন্দর আনন দর্শন করে আনন্দিত হয়েছেন।

মুখ্যশব্দ : মা মেনকার কন্যার প্রতি দর্শন-আকাঙ্খা।

কমলাকান্ত শাক্ত সাহিত্যে রামপ্রসাদ-এর পরই উল্লেখযোগ্য খ্যাতিমান কবি। মাতৃভাবের পরমার্থিক সংগীত রচনায় সাধক কবি রামপ্রসাদ-এর পরই কমলাকান্তের স্থান। রামপ্রসাদ ছিলেন মাতৃভাবের আবেগ বিহ্বলে কবি আর কমলাকান্ত ছিলেন সাহিত্য সচেতন শিল্পী কবি। কমলাকান্ত বিভিন্ন পর্যায়ের রচনা করেছেন। তিনি একখানি ধর্মতত্ত্ব সংক্রান্ত কাব্য লেখেন। প্রথম জীবনে তিনি 'সাধক রঞ্জন' নামে একখানি তন্ত্রসাধনার গ্রন্থ বাংলা কবিতায় রচনা করেছিলেন। তা থেকে তাঁর নাম হয় 'সাধক রঞ্জন'। তিনি বিভিন্ন পর্যায়ের শাক্ত পদাবলীর পদ রচনা করলেও তাঁর কবি প্রতিভার চরম উৎকর্ষ বা শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে আগমনী ও বিজয়ার পদে। সাধক কবি কমলাকান্ত ভট্টাচার্য অজস্র পদ রচনা করে আগমনী ও বিজয়ার দৃশ্যকাব্য বা নাটকের মতো লক্ষ্যগোচর করে তুলেছেন। কমলাকান্তের আগমনী ও বিজয়ার পদগুলি একত্রে একটি নিটোল কাহিনি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য শাক্ত পদাবলীতে মাতা কন্যার যে করুণ প্রতিচ্ছবি তুলে ধরেছেন তা সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যেতে পারে।

গিরিরাজ ও মেনকার একমাত্র স্নেহের কন্যা উমা। অতি অল্প বয়সে নেশাখোর নিঃস্ব ও ভিখারি মহাদেবের সাথে তার বিয়ে হয়েছিল। বিবাহের পর প্রায় এক বছর উমা স্বামীর গৃহে থাকেন। মেনকা দীর্ঘকাল কন্যা দর্শন থেকে বঞ্চিতা। তাই মায়ের হৃদয় ব্যাকুল হয়ে ওঠে কন্যাকে একবার চোখে দেখবার জন্য। উমাকে স্বপ্নে দেখে তার দর্শন আকাঙ্খার উদ্যোগ, ব্যাকুলতা ও আশঙ্কা

দিয়ে আগমনী সূচনা হয়েছে। কন্যার আগমনের পর বিদায় কালে বিষণ্ণ মাতার অশ্রু রুদ্ধ আশীর্বাদে সেই লীলানাট্যে যবনিকা ঘটেছে। মেনকার স্বপ্ন দর্শন থেকে শুরু দশমীর তিথির ভোরে বিদায় লগ্ন পর্যন্ত কমলাকান্ত প্রতিটি সংগীতে নাটকীয়তা, মনস্তত্ত্ব, গীতিরস ও বাৎসল্য বৃত্তির মানবিক আবেদনে বৈচিত্র্যমণ্ডিত ও রসসমৃদ্ধ করে তুলেছেন।

উমাকে স্বপ্নে দেখার পর মেনকার আর ধৈর্য ধরে না। মন খুবই উচাটন হয়ে ওঠে। ঘটক নারদের কাছ থেকে মেনকা শুনেছেন যে, শিব গায়ের চিতার ছাই মাখেন। গলায় সাপ দোলে, সুধা ত্যাগ করে বিষ পান করে।

কমলাকান্ত বলছেন শিবকে সন্তুষ্ট করে যদি উমাকে আনতে পারা যায় তবে উমাকে আর যেন স্বামীগৃহে পাঠানো না হয়। এই কথাই মেনকাকে জানাতে চান কবি।

সাধক কবি মেনকার দুঃখবেদনা, অপরূপ কৌশলে ফুটিয়েছেন। মেনকা পাষাণহৃদয় স্বামী হিমালয়ের কাছে অভিযোগ করেন, কেন তিনি কন্যাকে পিত্রালয়ে আনছেন না। অবশেষে, গিরিরাজ উমাকে এনে দিলেন মেনকার কাছে।

'গিরিরানী, এই নাও তোমার উমারে।
ধর ধর হরের জীবনধন।।"

মা মেনকা তখন কন্যা উমাকে নিয়ে কত আদর যত্ন করলেন। কিন্তু নবমীর নিশি অবসান হতে না হতেই হর এসে উমাকে নিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হন। তখন আর কি করবেন, শুধু ব্যাকুল হয়ে বলে উঠেন :

"ফিরে চাও গো উমা তোমার বিধূমুখ হেরি,
অভাগিনী মায়ের বধিয়া কোথা যাও গো।
এইখানে দাঁড়াও উমা বারেক দাঁড়াও মা
তাপের তাপিত তনু ক্ষণেক জুড়াও গো।"

এখানে বাঙালি মায়ের কন্যাবিরহের বাস্তব বেদনা গানগুলিকে একটা স্বতন্ত্র মানবিক মাধুর্য দান করা হয়েছে।

সাধক কবি কমলাকান্ত আগমনী ও বিজয়ার পদগুলিকে মাতৃ হৃদয়ের ভাব বৈচিত্র্য নাটকীয় পরিণতিতে একান্ত স্পষ্ট উজ্জ্বল করে তুলেছেন। এগুলির মধ্যে তত্ত্বকথা থাকলেও মানবিক অনুভূতি লীলাতে অতিব্যক্ত ঘটেছে। আগমনী গানে রয়েছে সন্তান স্নেহ ব্যাকুলতা মাতৃহৃদয়ের আরতি। মাঝখানে মা ও মেয়ের মিলনের ক্ষণিক দৃশ্য। আবার কন্যা বিরহ আনন্দ বেদনাকে আরও প্রগাঢ় ও ব্যাকুল করে তুলেছেন। আবেগ, উৎকণ্ঠা, মিলন-বিরহের মধ্যে কমলাকান্ত মাতৃহৃদয়ের চিরন্তন বাৎসল্যে প্রেমের প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন।

গ্রন্থপঞ্জিঃ মুখোপাধ্যায় ধ্রুবকুমার। শাক্ত পদাবলী মে ২০০৩। রত্নাবলী। কলকাতা - ৭০০ ০০৯।

বাউল ও রবীন্দ্রনাথ

বাপন মণ্ডল
তৃতীয় বর্ষ, বাংলা বিভাগ

প্রবন্ধের শিরোনামে বাউলকে প্রথমে করা হয়েছে। কারণ বাউল প্রচলন রবীন্দ্রনাথের আগে থেকেই। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পরে বিভিন্ন বাউলদের কাছে থেকে বাউলের রস সংগ্রহ করেছেন। প্রথমেই বলি, বাউল লোক সম্প্রদায়ের একটি সাধন-ভোজন গোষ্ঠী। গ্রামে-গঞ্জে গান করে ভিক্ষা করে বেড়ায়। আবার কেউ কেউ এদের পাগল, ক্ষ্যাপা বলে। বাউলদের সৃষ্টি হয়েছে বাংলার মাটি থেকেই। বাংলার নদী, মাঠ, জল সবকিছুই বাউলদের গানের উপকরণ। বাউলদের নির্দিষ্ট কোনো জাত-ধর্ম হয় না।

তাই লালন বলে —

"সব লোকে কয় লালন কি জাত?
সংসারে
লালন বলে জাতের কিরূপ
দেখলাম না এ নজরে"

বাউলরা একটা ধর্মেই বিশ্বাসী। মনের মানুষকে খোঁজার সাধনাই হল বাউলদের কাজ। তাদের একটাই ধর্ম "মানব ধর্ম"। সেখানে হিন্দু-মুসলিম, শিখ-জৈন, শেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গ কোনো কিছুই ভেদাভেদ থাকে না। অনুরূপভাবে কবিয়াল অ্যান্টনী ফিরিঙ্গিও এই ভেদাভেদের না থাকার কথা বলেছেন। তাই বলেছেন —

"খ্রিষ্টে আর কৃষ্টে কিছু তফাৎ নাইরে ভাই"।

বাউলদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রচলিত নাম হল — 'লালন ফকির'। 'বাউল' শব্দটি মনে আসলেই লালনের নাম আমাদের সামনে ভেসে ওঠে। লালনের জীবনী ও বাউল সত্তার আলোচনা প্রসঙ্গে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় 'মনের মানুষ' উপন্যাসটি লিখেছিলেন আর এই উপন্যাসকে কেন্দ্র করেই 'গৌতম ঘোষ'-এর চলচ্চিত্র রূপ দেন। সেখানে স্পষ্ট দেখতে পাই লালনের বাউল হওয়ার ঘটনা পরম্পরার উত্তরণ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বাউল বলা কি ঠিক হবে? তিনি কি একতারা হাতে নিয়ে গ্রামেগঞ্জে ভিক্ষে করে বেড়াতেন? না বেড়াতেন না। তবে আমরা তাকে 'বাউল' বলছি কেন? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রমাণ করেছিলেন বাউলের কোনো রূপ হয় না। বাউলের মতো হাতে একতারা ও বাউল পোশাক পড়লেই যে বাউল হওয়া যায়, সেটা একেবারে ভুল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এর একটাও করতেন না। তবুও তিনি 'বাউল'। তিনি খাতা-কলমে গভীর দার্শনিক চিন্তার মাধ্যমে বাউল-চর্চা করেছেন। খুঁজে চলেছেন মনের মানুষকে। লালন ফকিরের সেই দেহতত্ত্বের গানটি এখানে প্রণিধানযোগ্য —

"খাঁচার ভিতর অচিন পাখি
কেমনে আসে যায়।"

এই গানের গভীর গুরুত্ব রবীন্দ্রনাথকে করেছে

বিমোহিত। এরই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর মহাকাব্যধর্মী উপন্যাস 'গোরা'-তে 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি' গানটি তুলে ধরেছেন। এখান থেকেই বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথের মধ্যে 'বাউল সত্তা' ছিল।

জমিদারী দেখাশুনার জন্য যখন শহরকেন্দ্রিক জীবন থেকে বের হয়ে গ্রামবাংলার মাটিতে পা দিলেন তখনই খুঁজে পেলেন লোক-সংস্কৃতির উপাদানসমূহ। গ্রামবাংলার মানুষজনের দুঃখ-দুর্দশার কথা খুব কাছ থেকে শুনলেন এবং প্রত্যক্ষ করলেন। জমিদারী দেখাশুনার ফাঁকে ফাঁকে বাউলদের আখড়াগুলি পরিদর্শন করলেন। বাউল সাধক লালনের সঙ্গে ঠাকুরবাড়ির যোগসূত্র ছিল। আর সেই সূত্রেই লালনের বাউলসত্তা অনুপ্রেরণা দিয়েছিল রবীন্দ্রনাথকে। দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর লালন ফকিরের সঙ্গে বলে বাউল দর্শন তত্ত্ব আলোচনা করতেন। তিনি একটি লালনের ছবিও এঁকেছিলেন যেখানে দেখা যায় লালন বৃদ্ধ, লাঠি হাতে চেয়ারে বসে আছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বুঝতে পেরেছিলেন যে লোকসংস্কৃতি এক অমূল্য সম্পদ। তাই তিনি গ্রামের পতিত জমি খুঁড়ে অমূল্য সম্পদ খুঁজে পেয়েছিলেন। তাঁর চারটি প্রবন্ধের সংকলন 'লোকসাহিত্য' নামে একটি প্রবন্ধগ্রন্থ। 'কবি-সঙ্গীত' নামে একটি প্রবন্ধ রয়েছে যেখানে বাংলার লোকগান 'কবি-গান' নিয়ে আলোচনা রয়েছে।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবিতা, গল্প, প্রবন্ধের পাশাপাশি একতারার সুরে মনের মানুষের খোঁজ করেছেন। তিনি বাউলদের সুরকে কাজে লাগিয়ে নিজের মতো করে ভাব-কথায় প্রকাশ করেছেন। যদিও 'রবীন্দ্র-সঙ্গীত' একটি স্বতন্ত্র সৃষ্টি। লালনের গান যেমন লালনগীতি, রামপ্রসাদের গান রামপ্রসাদী তেমনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান 'রবীন্দ্র সঙ্গীত নামে পরিচিত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খুঁজে চলেছেন মনের মানুষকে। তাই তাঁর কবিতার ভাষায় —

"দেখেছি একতারা হাতে চলেছে গানের
ধারা বেয়ে
মনের মানুষকে সন্ধান করবার
গভীর নির্জন পথে।
কবি আমি ওদের দলে —
আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন।" (পনেরো)

বাউলদের গানগুলি রবি ঠাকুরের গানের উপর সোনার ফসলের বীজ ছড়িয়ে দিয়েছিল। তৎকালীন শিলাইদহে গগন হরকরা পোষ্ট অফিসে কাজ করতেন। পাশাপাশি বাউল সাধনাও করতেন। তাঁর একটি গান যখন একতারায় বেজে উঠল —

"আমি কোথায় পাবো তারে
আমার মনের মানুষ জেরে
হারায়ে সেই মানুষে তার উদ্দেশে দেশ-বিদেশে
আমি দেশবিদেশে বেড়ায় ঘুরে।"

এই গান শুনে রবীন্দ্রনাথের গা শিউরে উঠল। আর তখনই এই গানের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের রবি বাউল এমন এক গান রচনা করলেন যা হৃদয় ছুঁয়ে যাওয়া এক অসামান্য লোকায়ত গান। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের আন্দোলনে মুখরিত এই বাংলার আকাশ-বাতাসে সে সময় কবির কণ্ঠ গর্জে উঠল বাংলার প্রতি ভালোবাসার স্মারক হিসেবে রচিত হল এমন এক গান, যা বেজে উঠবে বাংলার মানুষের হৃদয়ে —

"আমার সোনার বাংলা
আমি তোমায় ভালোবাসি
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস

আমার প্রাণে, বাজায় বাঁশি।”

গানটি বর্তমানে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত। প্রতিটি বাঙালীর রক্তে মিশে আছে এই গান।

জমিদারী দেখাশুনার সময় বাংলদেশে থাকাকালীন বিভিন্ন রকমের বাউলের সংস্পর্শে এসেছিলেন বিভিন্ন ধরনের বাউলের কাছে শিখেছেন বাউলতত্ত্ব, বাউল সুর এক আদর্শ ছাত্র হিসেবে।

যেমন — নদীয়ার টহল বাউলের ‘হরিনাম দিয়ে জগৎ মাতালে’ - এই গানটির অনুসরণে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচনা করলেন এক অসামান্য গান যে গানে রয়েছে একলা চলা, একলা বাঁচার কথা —

“যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে
তবে একলা চলো রে।”

লালন ফকিরের মতো অনেক বাউল মনের মানুষের সন্ধান করেছেন অবিরত। তাই লালন বলছেন —

“মিলন হবে কত দিনে
আমার মনের মানুষেরও সনে”

আমাদের রবি বাউলও বাউলের সুরে মনের মানুষকে দেখেছেন রূপসাগরে —

“দেখেছি রূপসাগরে মনের মানুষ কাঁচা সোনা
ওগো তারে ধরি ধরি মনে করি, ধরতে গেলে
ধরা দেয় না...”

এই গানগুলির মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ নিজের বাউলসত্তা জাগিয়ে দিয়ে বাংলার গণ্ডি পার হয়ে বিশ্বের দরবারে উপনীত হয়েছে। উপরিউক্ত গানের সুরে তিনি এতটাই মাতোয়ারা ছিলেন যে কেই সুরে আরও একটি গান রচনা করলেন —

“ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে”

আমরা জানি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপাসনার জায়গা হল রাঙামাটির দেশ শান্তিনিকেতনে। এখানেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বেশিরভাগ সময় কাটাতেন এই রাঙামাটির দেশকে তিনি বাউলের সুর ভাটিয়ালিতে গেয়েছেন —

“গ্রাম ছাড়া ওই রাঙামাটির পথ,
আমার মন ভোলায় রে।”

বর্তমানে ওই রাঙামাটির দেশে বাউলের আসর বসে মেলাতে মেলাতে। এখনও পর্যন্ত খোয়াই হাটের বনে বাউলের আড্ডা হয়। সেখানে গেলেই মনে হয় বাউল রবীন্দ্রনাথ আপেপাশেই রয়েছেন।

‘রবি ঠাকুর কবি, উপন্যাসিকের পাশাপাশি হয়ে উঠলেন ‘বাউল’। যার মাধ্যমে বাউল এক উন্নততর জায়গায় আজ। রবীন্দ্রনাথ সচেষ্ট হয়েছিলেন বাউলকে এগিয়ে নিয়ে যেতে।

গ্রন্থপঞ্জিঃ
ক) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস
- অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
খ) গীতবিতান
গ) ইউটিউব

আমার চোখে অন্নদামঙ্গল

সাথী মণ্ডল
তৃতীয় বর্ষ, বাংলা বিভাগ

সারসংক্ষেপ :
মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যকে যে সমস্ত সাহিত্যিক পরিপূর্ণ করে তুলেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম একজন ব্যক্তি হলেন ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর। এবং তাঁর অন্নদামঙ্গল বাংলা সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ এক কাব্য। তিনি মূলত একজন রাজসভার কবি ছিলেন। তাই রাজবাড়ির চাকচিক্য তাঁর কাব্যে ফুটে উঠে। বর্তমান সময়ে সময়ে ভারতচন্দ্র রায় গুণাকার-এর কাব্য নিয়ে অনাবৃত আপত্তিকর বর্ণনা আছে বলে অশ্লীল কুখ্যাতি অর্জন করেছে। এখানে আমরা তার কাব্যের সারাংশ আলোচনা করে কাব্যটির সমালোচনা করার চেষ্টা করব।

মুখ্যশব্দ : অন্নদামঙ্গল কাব্যের পরিচয়, গদ্য সমালোচনা, ভাষা।

বাংলা সাহিত্য অনুসারে আমরা তিনটি যুগের কথা উল্লেখ পায় যথা - প্রাচীন যুগ, মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগ। তবে, প্রাচীন যুগ ও মধ্য যুগ-এর মাঝের অংশ অর্থাৎ ১২০১ - ১৩৫০ খ্রি. পর্যন্ত সময়টিতে তুর্কি আক্রমণের ফলে কোনো সাহিত্য রচনা হয়নি তাই এই সময় কালটিকে অন্ধকার যুগ বলা হয়। ১৩৬০ এর পর যে সমস্ত সাহিত্য রচনা হয়েছিল তাদের মধ্যে অন্যতম একটি হল অন্নদামঙ্গল কাব্য।

অষ্টাদশ শতাব্দীর সবচাইতে উজ্জ্বল ও বৃহৎ নক্ষত্র এই অন্নদামঙ্গল কাব্য। মধ্যযুগের বিখ্যাত লেখক ভারতচন্দ্র রায় গুণাকার এই কাব্য রচনা করেন। "কবিবর ভারতচন্দ্র রায় জীবন বৃত্তান্ত" থেকে জানা যায় : হুগলী জেলার অন্তর্গত ভুরশুট পরগণার পেঁড়ো গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন ১৭১৩ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁর পিতার নাম নরেন্দ্র রায়। পলায়ন জীবন এর মধ্য দিয়ে তিনি লেখাপড়া শিখেন। বিষয় কর্মের তদারকী করতে গিয়ে বর্ধমান রাজ্যের আমলাদের চক্রান্তে কারারুদ্ধ হন। সেখান থেকে পালিয়ে কটকে যান। পরে যেতে চান বৃন্দাবনে। পথে কুটুম্ব বাড়ির লোকেরা চিনতে পারলে তাকে ধরে বাড়ি নিয়ে আসে। এরপর নবদ্বীপ রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ পদ লাভ করেন। এর পর তার ভালো কাজকর্মের জন্য রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কাছ থেকে "কবিগুণাকার" উপাধি লাভ করেন। এবং রচনা করেন রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নির্দেশে অন্নদামঙ্গল কাব্য।

ভারতচন্দ্র রায়গুণাকার শুধু কবি নন, রাজসভার কবি। তাই রাজসভার সমস্ত কিছু তার সৃষ্টি চরিত্রগুলির মধ্য দিয়ে অন্নদামঙ্গলে ফুটে উঠেছে। এই কাব্যটিকে মূলত আটটি পালায় বিন্যস্ত তিনটি খণ্ডে বিভক্ত আখ্যানযুক্ত তিনটি কাব্য। এর একটি চিত্র এরকম —

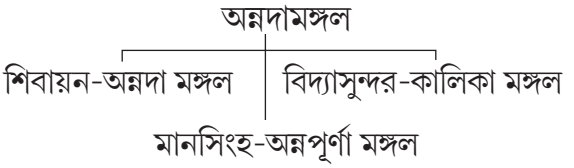

প্রথম খণ্ডে আছে দেবদেবীর বন্দনা ও মহারাজা

কৃষ্ণচন্দ্রের সভা বর্ণনার পর গীতারম্ভ। এরপর সতীর দেহত্যাগ ও তার পুনর্জন্মের কাহিনি ব্যাসদেবের দ্বিতীয়বার কাশী নির্মাণের ব্যর্থতা। এরপর দেবী শিব পূজা প্রচারের জন্য কুবেরের অনুচরকে শাপ দেন এবং হরিহোড় নাম নিয়ে এক দরিদ্র ঘরে জন্মগ্রহণ করতে বাধ্য করলেন। হরিহোড় মর্ত্যে জন্ম নিয়ে দেবীর কৃপায় দারিদ্র থেকে মুক্তি পেয়ে খুব ঘটা করে অন্নপূর্ণা পূজা প্রচার করলেন। কিন্তু বার্ধক্যে পৌঁছে নির্বুদ্ধিতাবশত তিনি তরুণী ভার্যাকে ঘরে এনে মহা অশান্তি সৃষ্টি করলেন। এরপর দেবী হরিহোড়কে ছেড়ে কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষ ভাবানন্দ মজুমদার এর গৃহে গিয়ে অচলা হন।

এই হচ্ছে অন্নদামঙ্গল কাব্যের প্রথম অংশের কাহিনি। এই কাহিনির মধ্যে আমরা দেখতে পাই, কেবলমাত্র ভাবানন্দ মজুমদার ছাড়া সব চরিত্রগুলিই সংস্কৃত অর্বাচীন থেকে নেওয়া হয়েছে। কাহিনিটি তেমন কিছু চিত্তাকর্ষী নয়, মৌলিকও নয়। তবে চরিত্র ও মনভঙ্গি অনুসারে তাঁর এই মঙ্গল কাব্যটি বিচিত্র কাব্য বলে পরিগণিত হয়। দেবদেবীর মহিমা স্বর্গলোক ত্যাগ করে বাংলাদেশে নরনারীর রূপ ধারণ করে পথেঘাটে অবতীর্ণ হয়েছে। তাঁর দেবতারা বাস্তব মানুষ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্নপূর্ণা, ব্যাসদেব - এদের চরিত্র পূবর্তন ক্লাসিক ও পৌরাণিক ঐতিহ্য কিছুমাত্র রক্ষিত হয়নি । তাঁদের নিয়ে ভাঁড়ামি রঙ্গরহস্য করে কবি দেবতাদেরকে আমাদের কাছাকাছি এনে ফেলেনে। ভারতচন্দ্র চরিত্র পরিকল্পনায় কোন মহৎ বৃহৎ আদর্শ সৃষ্টি করতে না পারলেও দেবতাকে মানব করে যে অভিনব আদর্শের সূচনা করেন তাই হচ্ছে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের শুভ সূচনা। তবে ভারতচন্দ্র রায় গুণাকারের অন্নদামঙ্গল কাব্যের কাহিনী ও চরিত্রেও বিশেষ প্রভাব আছে।

দ্বিতীয় খণ্ডটি হল, বিদ্যাসুন্দর-কালিকামঙ্গল। এই খণ্ডের বিষয়বস্তু হল বর্ধমান রাজ্যের রাজকন্যা বিদ্যা ও ভিনদেশীয় রাজকুমার সুন্দর-এর সঙ্গে প্রেম হয়ে যায় এবং এদের গোপন প্রেম চলতে থাকে। তারা গোপন মতে বিবাহ করে। এরপর বিদ্যার পিতা ও মাতা গোপন প্রণয়ের কথা জানতে পারে এবং সুন্দরকে প্রাণদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়। এরপর মা কালীর কৃপায় সুন্দর-এর প্রাণ রক্ষা হয় এবং উভয়ের বিবাহ দান শেষ পর্যন্ত এই কাব্যে বর্ণিত হয়েছে।

এতেও তার বিশেষ মৌলিকতা নেয়, কারণ এর পূর্বে বহু কবি বিদ্যাসুন্দর ও কালিকামঙ্গল সংক্রান্ত মঙ্গল কাব্য লিখেছেন। কিন্তু নায়ক নায়িকার কোন মুন্সিয়ানার পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে হিরামালিনী, বিদ্যার মাতা, নগর পাল, কোটাল ইত্যাদি অপ্রধান চরিত্রগুলি অনেক অংশে সুচিত্রিত হয়ে উঠেছে। এই কাব্যের বহুল স্থানে অনাবৃত ও আপত্তিকর বর্ণনা আছে বলে বর্তমানে ভারতচন্দ্র অশ্লীল বলে কুখ্যাতি অর্জন করেছে । তবে যাই হোক না কেন বিদ্যাসুন্দরের জন্য ভারতচন্দ্র আজও বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে আছেন। বিদ্যাসুন্দরের দু-একটি পালা বাদ দিলে ঐ শ্রেণির কাব্যের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট বলে পরিগণিত হবে। ভারতচন্দ্র কাব্যের মধ্যে ভাষার তির্যকতার যাদুমন্ত্র সঞ্চার করেছেন, তাঁর ফলে স্থূল বর্ণনাও লোভনীয় হয়েছে।

"অন্নদামঙ্গল"-এর শেষ অংশের নাম মানসিংহ অন্নপূর্ণা মঙ্গল। তিনটি খণ্ডের মধ্যে শেষ খণ্ডটি নিকৃষ্ট। এতে ইতিহাস ও উদ্ভট ব্যাপারটা এক সঙ্গে মিশে গিয়েছে। ভাবানন্দ মজুমদারের সহায়তায়

মানসিংহ যুদ্ধে রাজা প্রতাপাদিত্যকে পরাজয় করে খাঁচায় ভরে দিল্লির বাদ্‌শাহ জাহাঙ্গীরকে উপহার স্বরূপ দিতে যান। ভাবানন্দ মজুমদার ও দেবী অন্নদার কৃপা না পেলে মুঘল বাহিনী প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে কিছুতেই দাঁড়াতে পারত না। খাঁচায় বন্দি প্রতাপাদিত্যকে আর দিল্লি নিয়ে যাওয়া গেল না। বাংলার বীর অনাহারে দেহ ত্যাগ করলেন। এরপর বাদ্‌শাহর কাছে রাজা প্রতাপাদিত্যের মৃতদেহ পেস করেন। প্রতাপাদিত্যের পরাজয়ে বাদশাহ খুশি হলেন, কিন্তু দেবী অন্নদার কৃপা ও ভাবানন্দ মজুমদারের দৈবশক্তির কথা বিশ্বাস করলেন না। ভাবানন্দ মজুমদার এর প্রতিবাদ করলে তাকে কারাগারে বন্দি করা হয়। এরপর দেবীর ভূতপ্রেত দিল্লিতে উৎপাত শুরু করে । পরে এই বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অন্নদাদেবীর পূজা প্রচার করে উদ্ধার পান। এরপর ভাবানন্দ মজুমদার তার দুই স্ত্রী নিয়ে ঘরসংসার করতে থাকে। পরকালে অভিশাপ এর দিন পরিপূর্ণ হলে স্বর্গবাসী স্বর্গে ফিরে যান। তারই বংশধর হলেন মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র।

কবি ভারতচন্দ্র তাঁর সভাকবি ছিলেন। পৃষ্ঠপোষকদের আদি পুরুষের গৌরব বাড়ানোর জন্য কবি সত্য মিথ্যা অতিরঞ্জন মিশিয়ে মানসিংহ রচনা করেন। প্রতাপাদিত্যের প্রতি উদাসিন ছিলেন তাই তাঁর দুঃখজনক মৃত্যু বর্ণনাতেও তার লেখনি কুণ্ঠিত হয়নি।

অস্টাদশ শতাব্দীর সংস্কৃতির প্রতীক পুরুষ ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে কোনও মন্তব্য করা বিপজ্জনক। তাঁর রচনা বা উপাদান ও মনোভঙ্গিতে 'সীরিয়স' বা গভীর ভাবোদ্যোতক গঠন ঘটাতে না পারলেও তিনি অন্নদামঙ্গল কাব্যে এমন কিছু শ্লোক ব্যবহার করেছেন যা আমাদের বাঙালী সমাজে চিরকালের জন্য স্মরণীয়। এর কয়েকটি উদাহরণ যেমন —

১) "সে কহে বিস্তর মিছা যে কহে বিস্তর"

২) "মিছা কথা সিঁচা জল কতক্ষণ রয়"

এছাড়াও ভারতচন্দ্র রায়গুণাকার বিভিন্ন ভাষা যেমন — বাংলা, সংস্কৃত, ফার্সি শিখেছিলেন। তারই ফলস্বরূপ ফার্সি, সংস্কৃত, হিন্দি যথেচ্ছ শব্দভাণ্ডার থেকে শব্দগ্রহণ করে বাংলা ভাষার প্রকাশ ক্ষমতা বাড়িয়ে দিয়েছে। গ্রামীণ ও আবেক বহুল বাংলা ভাষাকে নাগরিক ও মনপ্রধান করে তুলেছে। এই জন্য তিনি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তারই লেখা এ বাক্যগুলির চমৎকারিত্ব ও বুদ্ধির দীপ্ত কী অসাধারণ —

১) "খুন হয়েছিনু বাছা চুন চেয়ে চেয়ে।"

২) "মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন।"

৩) "বাঘের বিক্রম সম মাঘের হিমানী।"

গ্রন্থপঞ্জিঃ
বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত,
বন্দ্যোপাধ্যায় ড: অসিতকুমার,
মডার্ণ বুক এজেন্সী, প্রকাশকাল ২০১৫-২০১৬

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য ও আধুনিক যুগে তার প্রভাব

তুহিন শুভ্র মণ্ডল
দ্বিতীয় বর্ষ, বাংলা বিভাগ

সারসংক্ষেপ

বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য ইতিহাসে রোমান্টিকতার মূর্ত প্রতীক। চণ্ডীদাস তাঁর এই কাব্যে প্রধান চরিত্র হিসেবে নিয়েছেন 'কৃষ্ণ ও রাধা' কে এবং পার্শ্ব চরিত্র হিসেবে 'বড়ায়ির' চমৎকার একটি ছবি এঁকেছেন। 'কৃষ্ণ ও রাধার' ব্যাকুল প্রেমের কথাই এই কাব্যের উপজীব্য বিষয়। মর্ত্যলোকে রাধার বিবাহ আয়ান ঘোষের সঙ্গে হলেও তিনি এক রাখাল ছেলে কৃষ্ণের জন্য পাগল। কৃষ্ণ রাধাকে ছেড়ে চলে গেলে রাধার আর দুঃখের শেষ থাকে না। কৃষ্ণের জন্য তিনি কখনোও ব্যাকুল হয়ে কাঁদেন, আবার কখনোও পাগলের ন্যায় হাসেন আর সমস্ত কাজেই ভুলভাল করে ফেলেন। তাঁর এই সমস্ত দুঃখের কথা বড়ায়িকে বলতে বলতে আবার অঝোর নয়নে কেঁদে ফেলেন। তার কথা শুনে বড়ায়িও সমান দুঃখে দুঃখিত হন এবং কৃষ্ণে সঙ্গে দেখা করানোর জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন।

বড়ু চণ্ডীদাসের 'রাধা ও কৃষ্ণের' প্রেমলীলা এবং বড়ায়ির মত এক অভিভাবিকা ন্যায় সখি বর্তমানকার সমাজের মানুষের মনে যেন এক দাগ কেটে দিয়েছে। তাইতো আজকের দিনেও আমাদের ঘরে-ঘরে মানুষের মনে-মনে, রন্ধ্রে-রন্ধ্রে রক্তের সঙ্গে মিশে আছে 'রাধা ও কৃষ্ণের প্রেমলীলা'।

মুখ্যশব্দ : শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, আধুনিক, প্রভাব, বড়ু চণ্ডীদাস, প্রেমলীলা, মর্ত্যলোক।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে যুগলক্ষণের দিক থেকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। সেগুলি হল — প্রাচীন যুগ, মধ্য যুগ ও আধুনিক যুগ। তার মধ্যে প্রাচীন ও মধ্যযুগের সময়সীমার মধ্যস্থিত সময় অর্থাৎ ১২০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত - এই ১৫০ বছর বাংলা সাহিত্যে কোনোকিছু সৃষ্টি হয় নি। এজন্য সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে এই ঊষার সময়কে বন্ধ্যাযুগ বা অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ হিসেবে অভিহিত করা হয়, যাকে ইংরেজীতে আবার Dark Age ও বলা হয়। এই সময় তুর্ক আঘাতে বাংলার জীবন ও সংস্কৃতি মূর্চ্ছিত ও অবসন্ন হয়ে পড়েছিল যেন তুর্ক আঘাতে বাংলা সাহিত্যে সৃষ্টির প্রেরণা হারিয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু ঠিক এরপরই অর্থাৎ বন্ধ্যাযুগের পরপরই রচিত হয় বড়ু চণ্ডীদাাসর 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যটি। 'চর্যাপদ' যেমন আদি বাংলা ভাষার প্রথম নিদর্শন ঠিক তেমনই 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' হল মধ্যযুগের বাংলা ভাষার প্রথম সাহিত্যিক নিদর্শন।

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের জহুরী বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে বাঁকুড়া জেলার বণবিষ্ণুপুরের কাছাকাছি কাঁকিল্যা গ্রামে বসবাসকারী শ্রীদেবেন্দ্রনাথের গোয়াল ঘরের মাচা থেকে এই পুঁথিটি আবিষ্কার করেন। আবার নিজেই তিনি ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে পুঁথিটিকে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন।

আবিষ্কৃত পুঁথিটি প্রাচীন বাংলার তুলোট কাগজে লিখিত। পুঁথিটি সম্পূর্ণ পাওয়া গিয়েছিল না অবশ্য। সেটা ছিল অখণ্ড অর্থাৎ পুঁথিটির প্রথম, মধ্যভাগ

এবং শেষের দিকের কিছুটা পাতা হারিয়ে গিয়েছিল বা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ফলে পুঁথিটির কাব্য পরিচয় জানা যায় না। বসন্তরঞ্জন কাব্যে কৃষ্ণলীলা দেখে এর নাম দিয়েছেন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য। এছাড়াও সেই পুঁথিটির মধ্যে একটি চিরকূট পাওয়া গিয়েছিল যাতে লেখা ছিল 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ব' — যা কাব্যটির নামকরণ নিয়ে পণ্ডিত মহলে আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। এমনকি পুঁথিতে কবি বড়ু চণ্ডীদাস নিজের নামও ভনিতায় লিখে রেখেছেন — যা পরবর্তীতে এক মানসিক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছে।

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যটি মোট তেরোটি খণ্ডে বিভক্ত এবং এই কাব্যের মোট পদ সংখ্যা ৪১৫টি।

'রাধা-কৃষ্ণের' প্রেমলীলা শ্রীকৃষ্ণকীর্তন মূল উপজীব্য বিষয়। কৃষ্ণে জন্ম থেকে শুরু করে মথুরা গমন, মথুরা থেকে কিছুক্ষণের জন্য প্রত্যাবর্তন এবং রাধা-কৃষ্ণের পুনর্মিলনের পর কৃষ্ণের কংস বধের জন্য পুনরায় মথুরা গমন ও রাধার বিলাপ — এইভাবেই কাহিনির ধারা বিস্তৃত হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত কাহিনির পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

ভূভার হরণের জন্য গোলোকের বিষ্ণুর কৃষ্ণরূপে এবং লক্ষ্মীর রাধাচন্দ্রাবলীরূপে মর্ত্যলোকে জন্ম হয়েছিল। নারীজন্ম গ্রহণ করে রাধা যে লক্ষ্মী এবং কৃষ্ণ যে তাঁরই স্বামী বিষ্ণু তা তিনি ভুলে গিয়েছিলেন। মর্ত্যজন্মে আয়ান ঘোষের সঙ্গে রাধার বিয়ে হয়েছিল। ফলে সম্পর্কেরা দিক থেকে রাধা, কৃষ্ণের মামি। বড়ায় বুড়ীর মুখে রাধার পরিচয় শুনেই কৃষ্ণ লক্ষ্মীর স্বরূপ চিনতে পারলেন এবং রাধাকে তার পূর্বস্বরূপ স্মরণ করিয়ে দিতে চাইলেন। কিন্তু রাধা ছিলেন অপরূপ সুন্দরী। দেহে ও মনে দুর্বলতা কোথাও নেই। হিন্দুর ঘরের মেয়ে, মনে সতীত্ববোধ গেঁথে আছে। সংস্কার তার চিরকালের সম্পদ। অবস্থাপন্ন ঘরের বধূ — সেকারণে গর্বও কম নয়। ফলে কুলবধূ রাধা কিছুতেই একজন সাধারণ রাখোয়াল ছোকরাকে আমল দেন না এবং তাঁর কোনো কথা বিশ্বাসও করেন না। তাই রাধা কৃষ্ণের কুপ্রস্তাবে চটে গিয়ে গালাগালি দিয়ে মেরে বড়ায়িকে তাড়িয়ে দেন। অবশ্য শেষ পর্যন্ত রাধা তার ভুল বুঝতে পারলেন এবং তিনি নিজের ও কৃষ্ণের যথার্থ স্বরূপ বুঝতে পারলেন। এবার রাধা যখন তার উদ্দেশ্য পূরণ করার জন্য কৃষ্ণের কাছে যায় তখন কৃষ্ণ রেগে গিয়ে বলতে থাকেন — "সোনা ভাঙলে আগুনের তাপে তাকে জোড়া দেওয়া যায় কিন্তু পুরুষের প্রেম ভেঙে গেলে তা আর জোড়া লাগানো যায় না।"

শেষ পর্যন্ত তারা একে-অপরকে মেনে নিতে সক্ষম হন এবং গভীর প্রেমে আসক্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু কৃষ্ণের প্রেম যেন কেবলমাত্র রাধার 'দেহকামনা নির্ভর'। অপর দিকে রাধা তাকে প্রচণ্ড ভালোবেসে ফেলেছেন। কৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করার জন্য তিনি বৃষ্টি — কোনোকিছুকেই তার ভয় হয় না। সমাজকে লঙ্ঘন করে তিনি এক অন্য ছেলেকে ভালোবাসছেন, এতে তার দুর্নামেরও ভয় হয় না। যেন সবসময় কৃষ্ণ তাঁর চোখের সামনে ভাসছেন।

একদিন হঠাৎ কৃষ্ণ নিদ্রায় রত রাধাকে ছেড়ে মথুরায় চলে যান আর তার দেখাশোনা করার জন্য বড়ায়িকে বলেন। কিন্তু রাধা কৃষ্ণকে না পেয়ে মনে করেন যে তার সমকিছুই হারিয়ে গিয়েছে। তিনি আর নিজেকে ধরে রাখতে পারেন না। তাঁর চোখ দিয়ে অনবরত আষাঢ়ের মেঘের মত জল ঝরতে থাকে। আবার তিনি কল্পনায় গড়া শ্রীকৃষ্ণের মূর্তির সম্মুখে কখনো বিলাপ করছেন, কখনো হাসছেন, বিষণ্ণ হচ্ছেন, কখনো কাঁদছেন। কৃষ্ণবিরহে তিনি তার নিজের ঘরকে অরণ্যতুল্য, প্রিয় সখীদিগকে জালস্বরূপ এবং নিজের নিঃশ্বাসকে দাবানল সমান মনে করছেন। এমনকি স্তরের উপরের মনোহর হারটিকেও তার ভারী মনে হচ্ছে। রাধা রন্ধন

ভালোই করত। কিন্তু এখন তার রন্ধনের অনেক দোষ। তিনি যেন 'রান্নার জুতীই' খুঁজে পান না। বিনা জলে চাল চড়ায়, পটোলের নামে কাঁচা সুপারি ঘিয়ে ভাজে, নিমঝোলে দিয়ে ফেলে লেবুর রস। এইরকমভাবে রান্নায় প্রচণ্ড গণ্ডগোল করেন। আর এসবেরই প্রধান কারণ হল কৃষ্ণ।

রাধা তাঁর বুকের ব্যথার কথা সমস্তই জীবনানন্দ দাসের বেহুলার 'ছিন্ন খঞ্জনার' ন্যায় বড়ায়িকে বলতে থাকেন। বড়ায়িও প্রাণপণ চেষ্টা করেন তাদের মিলন করানোর। কিন্তু কোনোভাবেই সম্ভব হয়ে ওঠে না। ফলে বড়ায়ি, রাধাকে কৃষ্ণবাঞ্ছা পূরণ করার জন্য কখনো 'চণ্ডীর' পূজা করতে, আবার কখনো 'বাসকসজ্জিকা' হয়ে কদমতরুতলে মাঝ বৃন্দাবনে অপেক্ষা করতে বলেন।

ফলস্বরূপ পরিশেষে বলতে হয় যে, মধ্য বাংলা সাহিত্যে রচিত বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যটি আধুনিক অর্থাৎ বর্তমানকার সমাজের মানুষের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত।

রাধা, কৃষ্ণের মামি হওয়া সত্ত্বেও তারা সম্পর্কের কথা না ভেবে একে অপরের সঙ্গে প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়েন। তেমনি বর্তমানের যুবক-যুবতীরা সম্পর্কের কথা না ভেবে, নিন্দার কথা না ভেবে সমাজকে লঙ্ঘন করে একে-অপরকে ভালোবেসে ফেলে।

রাধা, কৃষ্ণকে পাওয়ার জন্য যেমন সমস্ত দুর্যোগ পার করেছিলেন এবং সব ভয় দুরে ফেলে এসেছিলেন তেমন বর্তমানেও প্রেমিক-প্রেমিকারা তাদের সামনে থাকা বিপদগ্রস্ত পথ অতিক্রম করতে পিছপা হয় না।

রাধা যেমন কৃষ্ণকে ভাবতে-ভাবতে কোনো কাজ করতে গিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে পড়তেন তেমনই আজকালকার ছেলেমেয়েদেরকেও দেখা যায় যে তারা প্রেমে পড়লে বেশির ভাগ সময়ই একে-অপরের কথা ভাবতে থাকে এবং অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে।

'যত প্রেম তত অশ্রু' — এই লাইনের মর্মার্থে বলতে হয় যে রাধা যত বেশি প্রেমের গভীরে প্রবেশ করেছিলেন ততই তার জীবনে নেমে এসেছিল ট্রাজেডি আর চোখে ছিল আষাঢ়ের জল। ঠিক তেমনই বর্তমানকার প্রেমেও যেন মনে হয় 'অশ্রু বিনা প্রেম অর্থহীন'। প্রত্যেকটা প্রেম গড়াতে গিয়ে প্রেমিক প্রেকিমাকে তাদের চোখের স্বর্ণতুল্য জল ঝরাতে হয়েছে।

বড়ায়ি, রাধা ও কৃষ্ণের প্রেমকে সম্পূর্ণভাবে গড়ে তোলার জন্য নিজে প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন এবং অভিভাবকের মতো পরামর্শ দিয়েছিলেন। তাই বর্তমানেও প্রত্যেকটা প্রেমের ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে 'প্রেমটাকে সাফল্যমণ্ডিত করতে কারোও না কারোও অবশ্যই হাত রয়েছে।'

তাইতো বর্তমানেও আমাদের এই আধুনিক যুগের ঘরে ঘরে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা বর্তমান। যেন তাদের সেই প্রেমটা আমাদের কাছে আরোও মধুর এবং পূজনীয় হয়ে উঠেছে। মানুষ মরে যায় কিন্তু তাদের প্রেমটা বেঁচে থাকে আমাদের মনে-মনে, হৃদয়ে-হৃদয়ে।

সহায়কগ্রন্থপঞ্জিঃ

১। বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. অসিতকুমার। বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত। মডার্ণ বুক এজেন্সি। কলকাতা।
২। আচার্য্য, ড. দেবেশ কুমার। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস। ইউনাইটেড বুক এজেন্সি। কলকাতা।
৩। চট্টোপাধ্যায়, ড. পার্থ। বাংলা সাহিত্য পরিচয় ও সাহিত্যটীকা। তুলসী প্রকাশনী। কলকাতা।

৭তে শুরু ২২শে শেষ

ধীরাজ মণ্ডল
তৃতীয় বর্ষ, বাংলা বিভাগ

হে শুভ সাত তুমি কেন এত পবিত্র,
পবিত্র হয়েও বৃথা করো মান
কেন তুমি করিলে এত আমায় আপন।।
জানিতে যদি বাইশের কথা
জানাইয়া দিতে সেই কথা,
যদি না শুনিতাম কথা
দিতে আমার গোলাপের ব্যথা,
তখনই বুঝিয়া নিতাম আমি
এই শেষ বাইশের মনকথন।।

যীশু

ভাস্কর মণ্ডল
প্রথম বর্ষ, এডুকেশন বিভাগ

খড়ের চালের ঘরের ভিতর
জন্মেছিল এক শিশু
ভেবে চিন্তে মা মেরি
তার নামটি রাখে যীশু।
ছেলেটি ছিল যেমন জ্ঞানী
তেমনই ছিল বুদ্ধিমান
তার মতে সব মানুষই
ঈশ্বরের সন্তান।
তার ধর্ম যে মেনে চলে
তাদের বলে খ্রীষ্টান।
তার ধর্ম মেনে চলেন
সমস্ত অষ্ট্রেলিয়ান।

আমি, আমার মতো

অসীমা খাতুন
প্রথম বর্ষ, সাধারণ

'ভুল' আমার (?)
নাকি, সৃষ্টিকর্তার ?
একটু ... না অনেকখানিই আলাদা।
আমি, আমার মতো।
না-ই বা হলাম সবার মতো,
ঠিক 'আত্ম অহংকার' নয়
তবে হ্যাঁ, 'আত্ম অভিমান' আছে আমার।
'ভালো' আর 'খারাপ'
দুটি মিলিয়ে আমি।
কেউ কী সম্পূর্ণরূপে ভালো হতে পারো ?
যদি হয়, তবে তাঁর সন্ধান দিও আমায়।
কিছু যুক্তিহীন ভাবনা
আর একটা খামখেয়ালি মন,
এই নিয়েই আমার অগোছালো জীবন।
অনেক কিছুই পারি না আমি।
পারি না, কাউকে মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিতে,
পারি না, কাউকে মিথ্যে ভালোবাসতে।
তবে, সত্যের সাথে 'ঘৃণা' করতে ভয় করি না।
তাই হয় তো, আমি সবার প্রিয় না।
অনেক সময় নিজেকে প্রকাশ করতে পারি না।
কী করব ! আমি এরকমই ...
আমি, আমার মতো।

বিদ্যুৎ বাঁচাও

প্রদ্যুৎ মণ্ডল
তৃতীয় বর্ষ, বাংলা বিভাগ

সকাল থেকে ফ্যান চলছে
সাঁ-সাঁ তুলে ঝড়;
কেউ বলেনি, ও ভাই
ফ্যানটা বন্ধ কর।

কেউ বলেনি বিদ্যুৎ-ই দৈনন্দিনের জীবন
অকারণে নষ্ট করতে নেই;
হয় প্রতিদিন বাঁচা কঠিন
বিদ্যুৎ পালায় যেই।

বিদ্যুৎ তৈরির উৎসগুলো
যাচ্ছে কবে ধীরে ধীরে;
অদূর দিনে লড়াই হবে
ওই বিদ্যুৎকে ঘিরে।

বিদ্যুৎ বাঁচাও বাঁচব সবাই
ভেবে দেখ এর অর্থ
সবাই যদি না ভাবো
তবে আমার ভাবনা হবে যে ব্যর্থ।

সাক্ষাত

কণিকা মণ্ডল
প্রাক্তনী, বাংলা বিভাগ

যখন শুনি তোমার আসার কথা,
তখন তোমার কথা ভাবি অযথা।
আমার কল্পনা ছিল, তোমাকে নিয়ে ভিন্ন,
দেখামাত্রই বুঝলাম, ভাবনার নেই কোনো চিহ্ন।
হাঁটাচলা, কথাবলা, পড়াশুনা সবেতেই আছে মিল,
বাদবাকি সব ভাবনার রয়েছে অমিল।
সবার মন জয় করে চলে যাবে কখন,
নির্জনে বসে বসে শুধু ভাবব তখন।
জীবনে কখন কার সাথে দেখা হয়ে যায়,
সাক্ষাত হয়ে আবার হারিয়ে যায়।
অনেকে আছে বুঝেও বুঝতে পারে না,
আমার মনে হয়, হয়ত আছে তাদের মানা।
তোমার জীবনের এত সব গুণাবলী যে —
যেন সারাজীবন থাকে সেজে।
মাঝেমধ্যে বাইরের আবহাওয়া অনুভব করো —
আমি কামনা করি তুমি হও অনেক বড়ো।
পথ চলচে চলতে কাউকে দেবে না ধোঁকা,
আমার কথা স্মরণে রেখো ওগো মিষ্টি খোকা।

বুক ভরা ব্যথা

ঊর্বশী মণ্ডল
তৃতীয় বর্ষ, বাংলা বিভাগ

বুঝিবে একদিন বুঝিবে তুমি
ভাবিবে একদিন আমার কথা
খুঁজিবে একদিন তুমি আমায়
পাবে না সেদিন খুঁজে আমায় তুমি
থাকিবে সকলে সাথে তোমার
শুধু থাকিব না আমি
তখন নিজেকে মনে হবে বড় একা।
খুঁজিবে সেদিন খুঁজিবে
বহিবে নয়ন, কাঁদিবে অন্তর
তবুও খুঁজে পাবে না আমায়
বুঝিবে সেদিন আমার ব্যথা
ভাবিবে কী ভুল করেছি আমি
বারে বারে সেদিন ডাকিবে আমায়
বলিবে ফিরে এস
সেদিন আমি আর ফিরিব না তোমার কাছে
বুঝিবে সেদিন বুঝিবে।

মাতৃত্ব

নিরঞ্জনা দাস
প্রথম বর্ষ, বাংলা বিভাগ

দীর্ঘদিন ছিলাম মাগো তোমায় ছেড়ে আমি
মাগো তুমিই তো আছো জননী
যেও না তুমি মা আমায় ছেড়ে
মা তুমি চলে গেলে
দুঃখ কষ্ট প্রবেশ করবে আমার মনে
সর্বশ্রেষ্ঠ মা তুমিই আছো
আছো মা আমার জীবনে
ভালোবাসার মূল্য মা দেবো তোমায়
দেবো মা তোমায় কেমন করে
ভালোবাসাতে যে আছে অসীম শক্তি
জানো তো মাগো তুমি
ভালোবাসা দিয়ে শোধ করবো মাগো
তোমার ভালোবাসার মূল্য আমি।

সৌন্দর্য্য

নিরঞ্জনা দাস
প্রথম বর্ষ, বাংলা বিভাগ

সবুজের ভরা এই প্রকৃতি
কী সুন্দর দেখতে
অদৃশ্য এ হাওয়া যেন
ছুঁয়ে গেল আমার মনকে।
গাছের উপর পাখিগুলো কিচিমিচি করে
নিজেদের মধ্যে মধুর সুরে তারা
কী যেন গল্প করে।
ফুলের উপর প্রজাপতি উড়ে এসে বসে
অদৃশ্য এ হাওয়ায় ঘাসগুলো যেন
সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো দেখতে।

নারী

তৃপ্তি মণ্ডল
প্রথম বর্ষ, বাংলা বিভাগ

নারী আমি সেই অভাগী ভাবি সারাক্ষণ।
একস্থানে ঠাঁই হয় না, হয় গৃহ পরিবর্তন।।
গৃহ থেকে গৃহান্তর, যদিও আমার হয়।
সকল দুঃখ কষ্ট আমি একইরকমভাবে সই।।
কেন নারীকে বলে সবাই তার নিজের কিছু নেই।
সবাই জানে জগৎ চলে নারীর পিছু পিছু।।
নারী হয় ঘরের লক্ষ্মী, স্বামীর ঘরের অন্নপূর্ণা।
নারী ছাড়া এই ঘর সংসার, সবই অসম্পূর্ণা।।
নারী আমি সবই পারি, পারি না অধিকার ফলাতে।
তাই হয়তো মোদের সবাই রাখে পায়ের তলাতে।
তবুও যতই অবহেলা কর, কর পদতল।
নারী ছাড়া এ জগৎ সংসার সবই হবে অচল।।
এই সমাজের পুরুষ যারা নারীকে মারে।
ভুলো না সেই নারীই তারে গর্ভে ধারণ করে।।
নিজের বাড়ি ছেড়ে যখন যাই অন্যের ঘর।
সেই বাড়িকেই তখন তারা মানায় চিরন্তর।।
যখন সমাজ জানে সবই, সবই এই ব্যাপার।
তখন কেন নারী তবুও পায় না অধিকার।।
সংসারের শক্তি নারী বুঝতে যদি পারো।
পুরুষতান্ত্রিক সমাজ তারে যোগ্য সম্মান দিও।।

সারাদিন

লুৎফর রহমান
তৃতীয় বর্ষ, বাংলা বিভাগ

সকালে উঠিল রবি পূর্ব গগনে
পড়েছে সোনালী রঙ এ ভবনে।
পরিস্ফুটিত ফুল আম্র মুকুল
বসেছে ভ্রমর শুঁকেছে ফুল।।
খেয়েছে মধু আপন খেয়ালে
উঠেছে চাষির দল, চলেছে আপন কাজে
ফলেছে সোনার ফসল, সোনালী মাঠে,
পাখি সব গায় গান আপন মনে
ক্লান্ত হইলে তারা যায় ফিরে শান্তির নীড়ে;
রাখাল গোরুর পাল লইল মাঠে
শিশুগণ হেলেদুলে চলিল আপন ক্লাসে।
পাড়ার বউ-মেয়ে চলেছে স্নান ঘাটে
স্নান করিয়া কলস ভরিয়া তারা জল নিয়ে আসে।।
বাড়ি ফিরিয়া সকলে সারিল ভোজন
এই কাজে, সেই কাজে, গেল দিন মন।।

স্বর্গ লাভ

আসমাত নাদাপ
প্রথম বর্ষ, বাংলা বিভাগ

ওরে পথিক তোমার স্বর্গ লাভের
ইচ্ছা করে না।
মৃত্যু বর নিয়ে শুধু স্বর্গ লাভ
তা আর হয় না।।
যে জানে, সেই জানে!
ঘুমের চোখে ভোরে উঠিয়া দেখ
জুড়িয়া উঠিবে প্রাণ।
শুনতে পাবে কোকিলের, মধুর কণ্ঠের
স্বর্গ থেকে আসা গান।।
এটাই যে স্বর্গ লাভ, তুমি জানো না
যে জানে, সেই জানে!
ভোরবেলা আকাশের দিকে দেখ
একটি জ্বলতে থাকা তারা।
হাত বাড়িয়ে চাইলে পরে তুমি
কাছে পাবে স্বর্গ সুখ।।
এটাই যে স্বর্গ লাভ, তুমি জানো না।
যে জানে, সেই জানে!
শিশির ভেজা ঘাসে হাঁটিয়া দেখ
কত না আনন্দ লাগে।
ঘাসের উপর পা বাড়াতেই মনে হবে
শিরশিরিয়া উঠিল প্রাণ।
এটাই যে স্বর্গ লাভ, তুমি জানো না
যে জানে, সেই জানে!
বাড়িতে মা-বাবার চরণ ছুঁইয়া দেখ
ভগবানের স্মরণে পাবে ঠান।
মাথায় হাত পাড়তেই যেন তোমার অন্তরে
স্বর্গে হাত বাড়িয়ে দিবে।।
এটাই তো স্বর্গ লাভ, তুমি জানো না
যে জানে, সেই জানে।

আমার ভারত

পুতুল প্রামাণিক
দ্বিতীয় বর্ষ, বাংলা বিভাগ

আমরা সরল,
আমরা স্বাধীন,
আমরা ভারতবাসী।
জন্ম থেকে আমরা সবাই
দেশকে ভালবাসি।
ভারত মোদের জন্মভূমি
ভারত মোদের প্রাণ
তারই বুকে করছি বাস
গাইছি সুখের গান।
গরীব আমরা হতে পারি
তবু ছোট নই
বুকের মাঝে সাহস রাখি
করি না কভু ভয়।
কষ্ট পেলেও দুঃখ নেই
সবাই মোরা হাসি
এটাই বলে মনকে বোঝায়
আমরা ভারতবাসী।

প্রতিভা

রিজিয়া সুলতানা
প্রথম বর্ষ, বাংলা বিভাগ

রঙ্গ খেলায় হাসি
কখনো আবার কাঁদি।
রঙ্গ খেলায় হাসি
কী করে হয়, জানি না আমি!
বিভিন্ন প্রতিভা নিয়ে আছি,
দেখাতে গিয়ে কষ্ট আমি করি।
বাধা আসে অনেক
থামানোর চেষ্টা করে আমাকে।
তবু হার মানি না আমি,
করব বলেছি করবোই আমি।।

রঙ্গ খেলায় হাসি
কখনো আবার কাঁদি।
রঙ্গ খেলায় হাসি
ঘরে বসে বিভিন্ন কল্পনায় ভাসি
তার প্রতি ভালোবাসা নিয়ে
মনে যা আসে তাকে আঁকি।।
যদি তাকে না পারি ভালোবাসতে
কী করে আসবে প্রতিভা আমার মধ্যে।
সময় যায়, সময় আসে
শিল্পের মধ্য দিয়ে পরিবর্তন আসে।

রঙ্গ খেলায় হাসি
কখনো আবার কাঁদি
রঙ্গ খেলায় হাসি
জগৎটা যেন এক ছবি।
যে দিকে তাকাই
সে দিকেই সম্পদ দেখি।
খুঁজে নিতে পারলে
জীবন হবে সুখী
তবে আমার মধ্যে
কোন প্রতিভাটি আছে
খুঁজে নিয়ে প্রয়োগ করতে পারলে
হবে আমার উন্নতি।

জীবনের মূল্যবান সময়

সুজিত ঘোষ
অতিথি অধ্যাপক

কৈশোর বা বয়ঃসন্ধিকাল
জীবনের এমন এক সময় যখন
মানুষের কাছে আমি শিশু
সমাজ মনে করে ঐতিহ্য
সংরক্ষণের যীশু।
বাবা-মায়ের কাছে বাবুসোনা
আর মনের মধ্যে চলে ভবিষ্যতের
ভালোমন্দের আনাগোনা।
এমনি এক সময় যখন চায় না
মানতে কোনো অনুরোধ
শুনতেও দেয় না কোনো অপরাধ।
পারা যায় না থাকতে সমাজ
সেবা ছাড়া আর
একটু আনন্দেই হতে পারি আত্মহারা।
সইতে পারি না দুঃখের সময় দেওয়া
মিথ্যে আশা।
পারি না থাকতে ভালোবাসা আর
মর্যাদা ছাড়া।
সবাই করে আশা, হতে হবে বড়ো মানুষ
কিন্তু দেয় না সুযোগ
করে শুধু অবহেলা আর পেতে
হয় সামাজিক দুর্যোগ।
সকলের আশা পূর্ণ করে হতে চেয়েছিলাম
ভালো কিন্তু, সুযোগ ভালোবাসা
আর মর্যাদার অভাব আমাকে
করে রাখলো অপরিস্ফুটিত
এক আলো।

অজানা কবিতা

নুসরাত রহমান
প্রথম বর্ষ, ইংরেজী বিভাগ

লিখব এক কবিতা
নেই তার মন্দ জানা।
ভেবে দেখি কত
আসে না তার কোনো ধারণা।
তবে ভাবি, বৃথায় কী আমার ভাবনা।

শখ রয়েছে অনেক কিছুর
জানি না যে পূরণ হবে কী না?
তবুও স্বপ্ন দেখা হল আজ আমার সাধনা।

ভেবে ভেবে নষ্ট হল সব
খাতার পাতা
তবুও পূরণ হল না আমার কবিতা।
তবে কী পূরণ হবে না আমার কবিতা
পরে আছে শূন্য খাতার পাতা।

তবুও ভেবে দেখি লিখি আরেক পাতা
পূর্ণ হবে আমার খাতা
হিজিবিজি শব্দে ভরা
যার নেই কোনো অর্থ জানা
তবু পূর্ণ আমার ভাবনা।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চন্দ্রকান্ত সরকার
তৃতীয় বর্ষ, বাংলা বিভাগ

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তোমায় জানাই প্রণাম।
তোমার প্রতিভার যশে দেশ-দেশান্তরে বাংলার এত সুনাম।।
১২৬৮ বঙ্গাব্দের ২৫ বৈশাখের দিনে জন্মেছিলে তুমি।
জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর পরিবার তোমার জন্মভূমি।
লিখেছিলে তুমি কবিতা, উপন্যাস, নাটক আর গান।
সাহিত্যের প্রতিটি ছত্রে আছে তোমার অপরিসীম দাম।।
১৯১০-এ লিখলে গীতাঞ্জলি হল তার ইংরেজী অনুবাদ।
১৯১৩-য় নোবেল পেয়ে ভারতবাসীর পূরণ করলে সাধ।।
ভারত-বাংলার জাতীয় সঙ্গীত রচনায় আছে তোমার অবদান।
জালিয়ানওয়ালাবাগের প্রতিবাদে করলে নাইট উপাধি প্রত্যাখ্যান।
১৩৪৮ বঙ্গাব্দের ২২শে শ্রাবণ গেলে তুমি মর্ত্যধাম ছেড়ে।
অজস্র বাঙালির স্নেহ-ভালোবাসা-মায়া-মমতা ত্যাগ করে।

আমার মা

ঈশিকা সবনম
দ্বিতীয় বর্ষ, ইংরেজী বিভাগ

সবার থেকে ভালোবাসি
স্নেহময়ী মাকে;
সকল কাজের মধ্যে আমি,
খুঁজি শুধুই তাকে।

দুঃখ আঘাত যখন আসে!
কেউ তো থাকে না।
চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে,
বুকে টানেন 'মা'।

সবাই বলে ঠাকুর বড়
আমি বলি 'না'।
সবার থেকে বড় যিনি
তিনি আমার 'মা'।

খেলাবিদ্যা

পায়েল পাণ্ডে
দ্বিতীয় বর্ষ, বাংলা বিভাগ

ভালো তার আকাশ-প্রতাপ
ভালো না কদলীমুখ খেলা
না চাইতে হাতের তালুতে
ঈষদুষ্ণ দোলন পেলাম।

এই স্পর্শ ফেলে আসা যায়?
সঙ্গে নিয়ে আসি ও-অমুক।
এক একবার মুখ দিই। মুখ
তুলতে জান কয়লা হয়ে যায়।
আমি যাই পুরনো চুল্লীতে

যেসব অঞ্চলে অদ্যাবধি
কয়লা জ্বলবার জায়গা খোলা
এত মুক্ত বিধবার আঁচ।

হা হা আঁচ উঁচু করে তোলা
লা লা আঁচ উঁচু করে তোলা
আমি সামনে নীলডাউন হই।

এত কষ্ট পাবার পরেও
স্বীকার চৌষট্টিবার করি
কলাবিদ্যা খেলাটি ভালোই।

স্বার্থ

নুসরাত রহমান
প্রথম বর্ষ, ইংরেজী বিভাগ

তোমার অস্তিত্ব তুমি আজ নিজে খুঁজে নাও।
রয়েছো কোথায় তুমি তা আজ নিজে বুঝে নাও।
কেউ বা নীচু করে তোমারে, কেউ ওঠাতে চায়
অনেক উপরে।
কখনো ভেবে দেখেছো ভাই
কতজন সত্যিই তোমায় চায়।

কে জানে, কে চেনে, কে ডাকে তোমায়
কখনো ভেবে দেখেছো কী কেউ
কোনোদিন ভালোবেসে ডেকেছে তোমায়।

এ পৃথিবী বড়োই কঠোর,
সবাই রাখে নিজের স্বার্থের ওপর নজর,
তাই বলি নিজের ভালো মন্দ
আজ নিজেই বুঝে নাও।
নিজেকে আজ নিজেই খুঁজে নাও।

কুয়াশা ভরা সকালবেলায়, উত্তপ্ত করা
দুপুরে, সোনালি সেই সন্ধ্যায় তারা ফোটে।
সেই কালো রাতে বসে রয়েছে যখন একাই

কেউ কী আদর করে ডেকেছে তোমায় ?

শিক্ষা

ঈশিকা সবনম
দ্বিতীয় বর্ষ, ইংরেজী বিভাগ

শিক্ষা মোদের দেখায় আলো
জীবনেরই অন্ধকারে,
শিক্ষা শেখায় নবীন ভাষা
বলতে নিজের মতো করে।
শিক্ষা হল জ্ঞানের প্রদীপ
লাগেনা তেল সলতে,
শেখায় শুধু মোদের কে গো
স্বাধীনভাবে চলতে।

শিক্ষা চলায় আঁধার পথে
সঙ্গে নিয়ে জ্ঞানের আলো,
যার আলোতে বুঝতে পারি
কোনটি মন্দ কোনটি ভালো।
শিক্ষাকে তাই গ্রহণ কর
হৃদয় দিয়ে আনন্দতে,
যার আলোতে কাটাব জীবন
উজ্জ্বল আলোর সঠিক পথে।

ইতি বসন্ত

বসন্ত হল সেই ঋতু, যে ঋতুতে ঘুমের মধ্যে থেকে জেগে ওঠে এক নবীন প্রাণ। এবং প্রথম চোখ মেলেই সে তার উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে এই অচেনা বিশ্বকে জানতে চায়, চিনতে চায়। বসন্ত মানেই আবেগ, বসন্ত মানেই উচ্ছ্বাস, বসন্ত মানেই উৎসাহ। গাছে ফুল ফুটুক বা না ফুটুক, সবুজ কচি পাতায় দক্ষিণা বাতাস লাগুক বা না লাগুক, ঋতুচক্রের আবর্তনে প্রতি বছর বসন্ত আসছেই। যতই বসন্ত ফিরে আসুক যতই রঙ্গে রঙ্গে ভরে উঠুক ফুলের রাশি যতই আমরা পলাশ, কৃষ্ণচূড়া আর শিমূলের রং দিয়ে হোলি খেলি না কেন তবু বলব আমাদের হৃদয়ের বসন্ত কিন্তু ফুরিয়ে গেছে। বসন্তে আমাদের মন এখন তেমন আর দোলা দেয় না। বেশ কয়েকবার আগে দেখেছি পথের দুপাশে রক্ত রঞ্জিত ফুলের শোভা বর্ধন করত। ভ্রমর আর মৌমাছির গুঞ্জনে কোকিলের আকুল করা কুহু রবে মানুষের মন উদাস হয়ে যেত। কিন্তু সেইসব গাছ আছে, পাখি আছে, ফুলও আছে শুধু সৌন্দর্য ভোগ করার সেই মানুষগুলো নেই। এই বসন্তে এখন যদি আমরা কোথাও যাই প্রকৃতির রচিত এই অপরূপ রূপরাশির দিকে আর চোখ তুলে তাকাই না, বুক ভরে আর গ্রহণ করি না তাদের মাতাল করা মৃদুময় ছন্দকে। কারণ আমরা আমাদের হৃদয়কে মরুময় করেছি এই যন্ত্র সভ্যতার কাছে। ফলে প্রকৃতির সব রং বিকৃত হয়ে যাচ্ছে। আমরা পীড়িত নই বসন্তই বরং পীড়িত আমাদের মনে রং ধরাতে না পারার বেদনায়। তাই Facebook / Whatsapp থেকে একটু চোখ সরিয়ে নিয়ে আসুন না এই বসন্তে প্রকৃতির রঙ দিয়ে আমরা আমাদের হৃদয়কে রাঙ্গিয়ে তুলি।

ইতি -

ভাগ্যশ্রী মণ্ডল
বাংলা বিভাগ, দ্বিতীয় বর্ষ

প্রতি, পুরুষ

ছেলেটি যাচ্ছিল লেডিস হোস্টেলের সামনে দিয়ে, ছেলেটার হাঁটা চলায় গ্রাম্য ভাব, চুলের স্টাইলে আনস্মার্ট ভাব স্পষ্ট। কয়েকটি মেয়ে চিৎকার করে বলে উঠলো, দেখতো পোষ্ট অফিস খোলা কিনা? ছেলেটা ভয়ে ভয়ে নিজের প্যান্টের দিকে তাকালো। লজ্জায় লাল হয়ে গেলো ছেলেটি।

মনে মনে ভাবলো, আমি তো ওদের কিছুই করিনি, তাহলে? হ্যাঁ, পুরুষ মনেও কষ্ট হয়, তারাও শিকার হয় এডাম টিজিং-এর।

ওহ্ সরকারী চাকরী পাওনি, সেলস্ম্যানের কাজ করছো: তা মাইনে কত? খেয়ে পরে বাঁচে কিছু? প্রেমিকার মায়ের কাছ থেকে এ প্রশ্ন শুনে গুটিয়ে যায় অনেকেই। আরে আমার ছেলেটা তো বর্তমানে আমেরিকায় থাকে, তুই ওর ব্যাচমেট ছিলি না?

তা তুই এখন এই ছোট্ট মুদিখানার দোকানে! বুকের ভিতর রক্তক্ষরণ হয় বৈকি। ছেলেরা কাঁদলে বড্ড কাপুরুষ লাগে, তাই নোনতা জল ঝরাতে মানা। সেইজন্যই চোখের সামনে দিয়ে নিজের ভালোবাসার মানুষটি যখন শুধুমাত্র অর্থনৈতিক কারণে অন্যের বাইকে বসে ওড়না ওড়ায় তখন মনে হয়, আদৌ কি ভালোবাসা বলে কিছু ছিল? তবে কি সব অভিনয়?

দিনের শেষে বাড়ি ফিরে যখন ক্লান্ত পুরুষটি শোনে তার বাড়িতে চাল বাড়ন্ত তখন ক্ষিদের থেকেও বেশি কষ্ট হয়, পরিবারের লোকেরা না খেয়ে আছে জেনে।

ক্যানিং স্টেশনের কাছে তিন বছরের শিশু কন্যা রেপ হয়েছে শুনে, তার আর্তনাদ কানের কাছে স্বরধ্বনী হয়ে ঘুমন্ত মেয়েকে আঁকড়ে ধরে অসহায় বাবা। আর মনে মনে বলে, এরা কি মানুষ, এরা কি মনুষ্যত্ব হারিয়ে ফেলেছে! পরের দিন খবরের কাগজে সবাই দেখে গোটা পুরুষ জাতিকে গালাগালি দেওয়া হয়েছে।

ট্রেনে লেডিস কামরা আছে, প্রতিবন্ধী কামরা আাছে, বয়স্ক মানুষদের জন্য সিনিয়র সিটিজেনেরও সিট আছে, তবুও বয়স্ক মানুষকে দেখলে সিট ছেড়ে দাঁড়ায় কিন্তু একটা পুরুষই, হয়তো সে তখন ক্লান্ত শরীরটা সবে ঠেকিয়েছিলো ফোর্থ সিটেড। মা, স্ত্রী, প্রেমিকা, কন্যাকে রক্ষা করে একজন পুরুষ।

এমন অনেক হয়, মেয়েটি রীতিমত চাকরি করে, তবুও রেস্টুরেন্টের খরচ মেটাচ্ছে টিউশনি করা ছেলেটি। সে ভয়ে ভয়ে ওয়ালেট খুলে গুনছে, এ মাসে বাড়িতে কত দিতে হবে, চাকরির ফর্ম ফিলাপ। তারপর বাকি কত থাকছে!

ছেলে বললো বাবা বাজার থেকে নতুন একটা স্কুলের ব্যাগ এনে দিও; আগেরটা ছিঁড়ে গিয়েছে। বউ বলল, হ্যাঁ গো শুনছো এবার পুজোতে জামদানী শাড়ি চাই, গতবার তো হাজার টাকার শাড়ি দিয়ে পেরিয়ে গিয়েছিলে এবার ওসব চলবে না। বাবা বলল শরীরটা ভালো যাচ্ছে না, কবে থেকে বলছি, ভালো একটা ডাক্তার দেখাতে কিন্তু কে কার কথা শোনে, আজকালকার ছেলেরাও ঐ রকম। মা বলে উঠলো কবে থেকে বলছি ভালো একটা শাল কিনে দিতে আবার তো শীত এসে গেলো কিন্তু দিচ্ছে আর

কোথায়, মায়ের প্রতি ভালোবাসা থাকলেই তো এনে দিবে!

একটা পরিবারের কত কত স্বপ্ন যা তোমার ওপর নির্ভর করে। কখনো তুমি বাবা, কখনো তুমি আবার স্বামী, কখনো তুমি আবার ছেলে। সম্পর্কগুলি খুব সরল কিংবা জটিল, ঠিক ঝুলন্ত দড়ির উপর দিয়ে হাঁটার মতো। দায়িত্বের ভারে নুব্জে মেরুদণ্ডটা কেঁদে ওঠে মাঝে মাঝে। শুধু দুঃখ-কষ্টগুলো ওরা ছোট থেকেই লুকোতে শেখে, এই যা! তারাও চায় অফিস কিংবা দিনের শেষে কাজ সেরে বাড়ি গিয়ে ছেলের মুখে চাঁদের হাসি, বউয়ের ঝলমলে দু'চোখ ভরা ভালোবাসা আর মায়ের স্নেহভরা আদর।

যে মানুষদের জন্য আমরা পৃথিবীর আলো দেখেছি, যার অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে আমরা স্বাচ্ছন্দ্যে বসবাস করি। যে মানুষটি শীতের রাতে চুপিসারে ঘরে ঢুকে সন্তানের গায়ে ঢাকা দিয়ে দেয় লুকিয়ে লুকিয়ে সেই সমস্ত বাবাদের জানাই প্রণাম। যারা ট্রেনে-বাসে বাচ্চা কোলে মহিলাকে বলেন, এখানে বসুন, তাদের জন্য রইল শুভেচ্ছা।

সেই সমস্ত প্রেমিকাদের স্যালুট করি, যারা প্রেমিকার যাতে বদনাম না হয় বলে লুকিয়ে রাখে নিজের ভালোবাসা।

সেই সমস্ত পুরুষদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই, যারা বলেন মেয়েরা তো দশভুজা, ওরা না থাকলে আমরা অচল। যারা মেয়েদের সম্মান দেন নারী হিসেবে, মানুষ হিসেবে, তাদের আমি কুর্নিশ করি।

ইতি -

আহসানূর খাতুন

অতিথি অধ্যাপক

আত্মবিশ্বাস

সেখ আত্তারুল
বাংলা বিভাগ, প্রাক্তনী

আমার আবার এগুলো জানার আগ্রহ খুব। কিছুদিন থেকেই তার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য প্রাণপন চেষ্টা করছি। কিছুতে সে ইচ্ছা পূরণ হচ্ছে না। যার কথা বলছি সে হচ্ছে 'কলেজ টপার'।

তার কথা শুনতে পাওয়া যায় অদ্ভুত ধরনের। সে নাকি মাত্র কয়েক মাস পড়েই কলেজ টপার বলে গণ্য হয়েছে। আদৌ জানি না তা কিরূপে সম্ভব। হলেও হতে পারে। কারণ স্বপ্ন বা ভালোবাসার মধ্যে প্রায় সবই সম্ভবপর হয়ে ওঠে। কোনো এক বিশিষ্ট ব্যক্তির মাথায় এই অলৌকিক চিন্তাধারা এসেছিল।

আমি আর আমার বন্ধু গিয়েছি মসজিদে শুক্রবার নামাজ আদায় করতে। কি বলা যেতে পারে আল্লার আরাধনা করতে। আর শকুনের চোখ দিয়ে দেখলে এক্সেসাইজ করতে।

নামাজ আদায় করে বেরোচ্ছি, এমন সময় তার সাথে মুখোমুখি পর্যায় হলেও বুঝিনি সে কে। আমার বন্ধু বলে উঠল, 'কি রে, কি খবর? তারপর এখন তোর কি কাজ চলছে?'

আর একজন নাম তার হুসেন আলি খাঁ। মাথার চুল উড়ে উড়ে যাচ্ছে। মুখ পরিস্কার কোন হাজির মত। সুভদ্র, সুশিক্ষিত এবং লুঙ্গি পরা। যা আমি দেখতে পেলাম আর কি।

হুসেন বলল, 'এই চলছে মোটামুটি। যেদিকে আল্লাহ্ রাসুল নিয়ে যাবেন ভেসে চলেছি।'

আলাপ-সালাপ ভালোই হল। এক পরিষ্কার জায়গা দেখে আমরা বসলাম। এই সেই হুসেন যার কথা আমি তোমাকে বলেছি। আমাকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'আমার বন্ধু'।

আমিও গল্প করতে করতে বলেই ফেললাম — 'ভাই, একটু বলবে তোমার 'টপার' হবার গল্প কথা।'

হুসেন বলল, 'ভাই, টপার তো তুমিও। আমি কেবল সাক্সেস পেয়েছি, অন্যান্যরা পায়নি বা পেয়েও হারিয়েছে।'

সে পরে না। শিখে যায়। দীর্ঘদিন। আমরা বই পড়ি, সে পড়ে মানুষ। প্রতিটি মানুষ আলাদা পরিবেশে বড় হয়েছে। কেউ সুখ পেয়েছে, কেউ বা পেয়েছে কেবল দুঃখভরা সকাল-সন্ধ্যা-রাতটা — সারা জীবনটা।

কেউ খেয়েছে, কেউ আবার না খেয়েই ভালো ঘুম দেয়। প্রত্যেক মানুষের জীবনে ঘটে যায় কোনো না কোনভাবে দুঃখ, মনমরা ভাবটা। জীবনে সুবিধার চেয়ে অসুবিধাই বেশী।

ভালোবাসার চেয়ে ছাড়াছাড়িই বেশী। রাস্তার পাগলের প্রাণ আছে, জীবন নেই। শব্দ ছাড়া ভাষা কি করে হবে? তবুও তারা এখনকার নোংরা ওখানে করে, ওখানকার নোংরা এখানে। বলে তাতেই তারা সুখময় জীবন নিয়ে বেঁচে থাকে।

লেখকের ভাবধারা থেকেই বলছি প্রায় ছাত্রছাত্রীই রাট্টা বা মুখস্ত বিদ্যা করতেই ব্যস্ত। আর তা না হলেও চলে না। কারণ তাতেই নাকি বেশী নম্বর

পাওয়া যায়। নম্বর না পেলে পড়াশুনা জলে ডুবে যাবে। মানে বাঙালি চাকুরিজীবী জীব। জলে মাছের যেমন হয়। মানুষ আবার জলে বাঁচতে পারবে না। তাছাড়াও আর এক পথ আছে। মানুষ গাছেই কেন থাকে না! ও তা তো তাদের পূর্বপুরুষ করেছিল।

গাছ থেকে পড়ে যাবার ভয় থাকলেও যে তার যা সুখ তা যে সৌন্দর্যাতীত। জিত হবে ভারত-বাঙালির।

আমি বললাম, 'কি কি পড়া হল তোমার?'

হুসেন বলল, 'যা পড়েছি, মন প্রাণ ধ্যান দিয়ে ভালোবেসে।'

তাছাড়া মনের ইচ্ছা যে কত উচু তা তার প্রথম কথায় আমি টের পেয়েছি। কেননা, যখনই যে বলল, যে দিকে আল্লার রসুল নিয়ে যান সেদিকে যাচ্ছে সে। আসলে এটা তার আত্মবিশ্বাস। আর বিশ্বাসের মধ্যেই তো মূর্তিও ঈশ্বর হয়ে যায়। যদিও প্রত্যেক মানুষের হৃদয়ে ঈশ্বরের বাস। তবুও আমরা মন্দির প্রতিষ্ঠা করি। কারণ মানুষের হৃদয় তো একাত্ম মন্দির ব্যক্তিগত। আর পাথর, নুড়ি, বালি, ইট দিয়ে তৈরি মন্দির সবার সেখানে আনাগোনা। আসলে সব জিতে নেওয়া যায় আত্মবিশ্বাসে। আত্মবিশ্বাসটা এমন হওয়া চাই যে পরাজয়কেও পরাজয় করে। জয় করে নেয় সবকিছু। নিজের জীবনকেও।

হরিণ শিকার

রাকেশ মণ্ডল
দ্বিতীয় বর্ষ, সংস্কৃত বিভাগ

নিষাদ পুরী নামে এক জায়গায় বিক্রম দেবরাজ নামে এক রাজা ছিল। তাঁর দুই স্ত্রী ছিল ইন্দুমতি ও অবন্তিকা। তার রাজ্যের চারিদিকে সবুজ গাছপালায় ঢাকা। আর সেখানে বিভিন্ন রকমের রঙবেরঙের পাখি কিচিমিচি করে সুন্দর বনে ঘুরে বেড়ায়। সেই সুন্দর বনে বিভিন্ন রকমের পশু ও পাখি ছিল এবং বিভিন্ন রকমের ফুল গাছ ছিল। সেই বনের মধ্যে ফুলের এত সুগন্ধ যেন মানুষের মনকে হরণ করে তুলত। সুন্দরবনকে যেন স্বর্গের সুখের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। সেই রাজ্যে ক্রূরকর্মা ও কাত্যায়ন নামে দুই স্বামী ও স্ত্রী বাস করত। তার স্বামী মৃগয়া করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করত। রাজার স্ত্রী ইন্দুমতি রাজাকে জিজ্ঞেস করল, আমাকে না অবন্তিকাকে, কাকে বেশী ভালোবাসো? রাজা সমান চোখে কাউকে অবহেলা না করে বলল যে, দুইজনকেই বেশী ভালোবাসি। রানী ইন্দুমতিকে আশ্বস্ত করার জন্য বলল যে অবন্তিকার থেকে তোমাকে বেশী ভালোবাসি। রানী ইন্দুমতি একদিন হরিণের মাংস খাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করল। রানী ইন্দুমতি রাজাকে বলল যে, আমি হরিণের মাংস খেতে চাই। রানী ইন্দুমতি এটাও বলল যে যতক্ষণ হরিণের মাংস না আনা হচ্ছে ততক্ষণ সে খাবার খাবে না। তখন রাজা আদেশ দিল শিকারীকে ডেকে নিয়ে আসার জন্য। শিকারী ক্রূরকর্মা রাজার নিকট এসে উপস্থিত হলেন এবং প্রণাম জানালেন। রাজা ক্রূরকর্মাকে আদেশ দিল যে তাঁর স্ত্রী হরিণের মাংস খেতে চায়। ক্রূরকর্মা বলল, “হে মহারাজ, আমি যতক্ষণ না হরিণ শিকার করে আনছি, ততক্ষণ আমি বাড়ি ফিরব না।” রাজার আদেশে ক্রূরকর্মা বেরিয়ে পড়ল সুন্দরবনের দিকে। সুন্দরবন গিয়ে ক্রূরকর্মা শিকার খুঁজতে লাগল। শিকার খুঁজতে খুঁজতে সন্ধ্যা পেরিয়ে গেল তবুও সে একটাও হরিণ শিকার করতে পারল না।

দ্বিতীয় দিন ক্রূরকর্মা আবার শিকার খুঁজতে খুঁজতে একটা হরিণীকে দেখতে পেল। হরিণীটা গাছের ঝোপঝাড়ে কি যেন খোঁজাখুঁজি করছিল। ক্রূরকর্মা নিঃশব্দে ধনুক নিয়ে হরিণীটার উপর লক্ষ্য রাখল। ধনুক নিয়ে হরিণীটার উপর লক্ষ্য রাখতে রাখতে হরিণীটার নিকট পৌঁছে গেল। শিকারীকে দেখে হরিণীটা হতাশ হয়ে গেল। হরিণীটা শিকারীকে বলল, “আমাকে যেতে দাও, আমার স্বামী অসুস্থ। যদি আমি ঔষধ না নিয়ে যাই, তাহলে আমার স্বামী মারা যাবে।” তখন শিকারী বলে যে, যদি আমি তোমাকে যেতে দিই তাহলে রানী ইন্দুমতির হরিণের মাংস খাওয়ার ইচ্ছা কিভাবে পূরণ করব? হরিণের মাংস না নিয়ে যদি মহারাজের কাছে যাই, তবে মহারাজ আমাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করবে। তখন হরিণীটা শিকারীকে বলল, আমি আমার স্বামীকে ঔষধ দিয়ে ফিরে আসবো। শিকারী বলল, যদি তুমি না আসো

হরিণীটা বলল, আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, আমি ঠিকই আসবো। শিকারী বলল, আচ্ছা তাহলে তুমি তাড়াতাড়ি যাও যাতে সন্ধ্যা হতে হতে তুমি ফিরে আসতে পারো।

হরিণীটা দুঃখিত মনে বাড়ি ফিরল। বাড়ি ফিরে তার স্বামীকে ঔষধ খাওয়ালো। কিছুক্ষণ পর সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। হরিণীটা তার স্বামীকে তখন সবকথা খুলে জানালো সুন্দরবনে যা যা ঘটেছে। সেই কথা হরিণীটার হরিণছানাটাও শুনে ফেলল। হরিণীটা তখন শিকারীর কাছে যাওয়ার জন্য তার বাচ্চা ও স্বামীর কাছে বিদায় চাইল। সেই সময় হরিণছানা তার মা হরিণীকে বলল যে, মা তোমার বদলে আমি যাব। মহারাণীর আমার নরম নরম মাংস খেতে ভাল লাগবে। তার মা বলল, না, তোমাকে যেতে হবে না। এই বলতে বলতে হরিণীটার চোখে জল এসে গেল। তখন হরিণীটার স্বামী হরিণটা বলল, তোমরা কেউই যাবে না, আমি যাব। আমি তো অসুস্থ। আজ না কাল মারা যাব। হরিণ ও তার বাচ্চার কথা শুনে মা হরিণীটার চোখ থেকে জল পড়তে লাগল। হরিণীটা বলল, আমরা সবাই শিকারীর কাছে যাই। শিকারী আমাদের মধ্যে যাকে নিবে, সেই মহারাণীর খাদ্যের আহার হবে। এই বলে হরিণীটা তার স্বামী ও বাচ্চাকে নিয়ে শিকারীর কাছে গিয়ে উপস্থিত হল। হরিণীটা শিকারীকে বলল, তুমি আমাকে নিয়ে চলো। মহারানীর আমার মাংস খেতে ভাল লাগবে। সঙ্গে সঙ্গে হরিণছানাটি বলল, তুমি আমাকে নিয়ে চলো। মহারানীর কচি হরিণের নরম নরম মাংস খেতে বেশী ভাল লাগবে। তখন হরিণটাও একই কথা বলল। এদের সকলকে দুঃখিত অবস্থায় দেখে শিকারীর খুবই মায়া হল। শিকারী তখন কাউকে সঙ্গে না নিয়ে একাই রাজার দরবারে এসে রাজার কাছে উপস্থিত হল এবং সুন্দরবনে যা যা ঘটেছে সব কথা খুলে বলল। সবকথা শুনে রাজা শিকারীর খুব প্রশংসা করল এবং তাকে উপহার দিল। রাজা ইন্দুমতিকে বলল যে, যখন কোন রাজ্যে প্রজারা বিপদে থাকলে প্রজাদেরকে রক্ষা করাই প্রধান কর্তব্য, তেমনি হরিণের মাংস খাবার আকাঙ্খায় তার পুত্র সন্তান ও স্বামী থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করা হয়, তাহলে তা মহাপাপ। এর ফলে বনের সৌন্দর্য, পরিবেশের সৌন্দর্য, প্রাকৃতিক সম্পদ নষ্ট হবে এবং হরিণের অবলুপ্তি ঘটবে। বনের পশু, পাখিকে রক্ষা করাই মানুষের প্রধান কর্তব্য।

('লিটল কৃষ্ণ' আখ্যান অনুসারে)

অসহায় প্রেম

নাওয়াজ সরিফ
প্রথম বর্ষ, এডুকেশন বিভাগ

মালদা জেলার অন্তর্গত এক আদিবাসী এলাকা, যার নামকরণ করা হয়েছে 'মানিকনগর'। পাঁচজন পড়ুয়া কর্মব্যস্ততার মধ্যে থাকা সত্ত্বেও ছুটি কাটাতে যায় পৃথিবীর এক মুক্তোর মতো স্থানে। 'মুক্তা' বলতে কাশফুল যেখানে অবস্থিত রাজমহল ও তিনঘরিয়া। যার মধ্যখানে অবস্থান করে সুগভীর গঙ্গা নদী। চেষ্টা করলে আপনিও যেতে পারেন সেই মুক্তার আদিবাসী এলাকায়।

মুক্তার মতো আদিবাসী এলাকা। যেতে হবে, যাবেন কিসে ? যার দূরত্ব প্রায় ৯৫ কিমি। অসম্ভব যাওয়া, কোনো যানবাহনের ব্যবস্থা নেই, আছে তো একখানি নৌকো, যা আবার সপ্তাহে একবার যাতায়াত করে। আপনাকে সেই নৌকায় যাত্রা শুরু করতে হবে।

ভ্রমণে এ তো একা যাওয়া যাবে না সেই মুক্তার দেশে - আরোও চারজন সঙ্গী চাই। তারা হয়তো আপনার মতো শান্ত ও ভদ্র নয়। রোজিন রেজা - প্রেম পাগল, মহঃ ফারুক - নিদ্রা পাগল, শুভম - পাঠ্য পড়ুয়া, বিকাশ - ভ্রমণ পাগল। এরা নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য বহন করছে।

সেই চারজন সঙ্গী নিয়ে বেরিয়ে যেতে হবে সোরমারা ঘাটে। অর্থাৎ সিরাজউদ্‌দৌলাকে যেখানে হত্যা করা হয়েছিল। নৌকায় প্রায় এক ঘন্টা চলার পর হঠাৎ এক জায়গায় বন্ধ হয়ে যায়, সেইখানে এক বুক জল। কিন্তু আর কি! সেইখানেই নামতে হবে। আপনারা তো নামার জন্য অনাগ্রহী। কিন্তু উপায় ?

তারপর ঝাউ গাছে ভরা বন দিয়ে ও বাবলা গাছের ছায়া দিয়ে আপনাকে হাঁটতে হবে। আপনি তো আপন মনে হেঁটে চলেছেন। কিন্তু বাকি চার বন্ধু যেন অসীম ক্লান্ত। তারা এক আদি পুরাতন শিশু গাছের তলায় কিছু আহার গ্রহণ করে এবং নীরব পাখিদের সাথে বিশ্রাম করে।

অবশেষে সময় যখন মধ্যাহ্ন দুপুর, প্রখর-উত্তাপ সেই কাঠফাটা বালির চরের উপর দিয়ে হাঁটতে শুরু করলেন। হাঁটতে হাঁটতে প্রায় সন্ধ্যা ৬.৩০ সময় হয়ে যায়।

আপনি লক্ষ্য করবেন চার বন্ধু খুঁজবে খাদ্য ও বিশ্রামালয়। কিন্তু আপনি খুঁজবেন গ্রামের অসহায় মানুষের দুঃখ ও যন্ত্রণা।

কালি মাখানো একখানি ল্যাম্প নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দুই কুমারি। তাঁরা আপনাদের জন্য একখানি ঘরের ব্যবস্থা করেছে, তা আবার চালবিহীন। আপনি দেখবেন আপনার চার বন্দু তাস প্রিয়, তাই তারা দুই চার দান তাস পিটিয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু আপনি তখনও পড়ে রইবেন সেই কাল্পনি জগৎ-এ। সারারাত তো মশা আপনাদের সাথে ঠাট্টা করবে, তারা আলোচনা

করবে 'পেয়েছি মালদার শুদ্ধ রক্ত'। এইভাবে সকাল হবে।

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে প্রথমে যাবেন সেই কাশফুল ও গঙ্গা নদীর তীরে। সেখানে দেখবেন এক আশ্চর্যজনক ঘটনা। যেন দুর্গার পায়ে পড়ে থাকা অঞ্জলি দেওয়া ফুল। তাদের হত্যা করেছে পাহাড়ি এলাকার ডাকুরা। তারপর এক অদ্ভুত দৃশ্য — এক অপূর্ব কুমারি মেয়ে বন্দুক হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তাঁর রূপ ও সৌন্দর্য যেন জগৎকে জয় করেছে। আপনি তাকে প্রশ্ন করার ক্ষমতা হারাবেন। আপনার বন্ধুদের কুমারি মেয়ে সাবধান করে দেবে - যেন অস্ত্র ছাড়া বাইরে বার না হয়।

ইতিমধ্যেই লেখক বন্দুকধারী কুমারি মেয়ের প্রেমে আবদ্ধ হয়েছে। ফিরে এসে তার সম্বন্ধে দুই অনাথ কুমারি মেয়ের কাছে সমস্ত ঘটনাটি শুনলেন।

যখন রাত প্রায় ১টা সে সময় এক নুপূর পড়া মেয়ে যেন নৃত্য করছে। তা দেখবার জন্য আপনি আসতে আসতে বাইরে আসবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য - একটা ছোট্ট খেঁকশিয়ালের বাচ্চা আপনার সামনে হাজির, তা দেখে ছুটে যাবেন সেই নৃত্য ঘরের দিকে। আপনার চিৎকারের কারণে কুমারি মেয়ে প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে আপনাকে জড়িয়ে ধরবে। তারপর থেকে শুরু হল আপনার আর এক নতুন জীবন।

পরের দিন পাঁচ বন্ধু মিলে সে পৃথিবীর সুন্দরময় কাশফুলের বনে ঘুরতে বের হলে এক বৃদ্ধ অসহায় আপনাদেরকে ইঙ্গিত করবে কিন্তু কথা বলবে না। কারণ তার জিহ্বা কেটে নিয়েছে পাহাড়ি এলাকার ডাকুরা। তাই প্রাণ রক্ষার জন্য আপনাদের পালিয়ে যেতে বলবে।

সেখানে দেখবেন এক আশ্চর্যজনক ঘটনা। একটু এগিয়ে গেলেই শুনতে পাবেন এক বিকট শব্দ, শব্দটি এসে লাগবে আপনার বৃহত্তর হৃদয়ে। তারপর এক মর্মান্তিক ঘটনা। কাশফুল যেন গিরগিটির মতো রঙ বদলে দিয়েছে। সে যেন হঠাৎ সাদা থেকে লাল রঙ ধারণ করেছে। কাশফুলের উপর পড়ে অনেক ডালিয়া ফুল দিয়ে খোঁপা বাঁধা এক বন্দুকধারী কুমারি মেয়ে। তখন যেন আপনি আর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবেন না।

তারপর একদল কালো কুর্তা পড়া বন্দুকধারী ডাকু আপনাদের দিকে এগিয়ে আসবে। প্রাণ বাঁচানোর জন্য অস্ত্রহীন হয়ে তাদের মোকাবিলা করতে করতে আপনার বুকের ডানপাশে লাগবে এক গুলি। চিৎকার করে বন্ধুদের পালানোর কথা বলতে চাইলেও সেই ক্ষমতাটুকু আপনার থাকবে না।

পরের দিন চার বন্ধু বুকভরা দুঃখ নিয়ে বিদায় নেবে অনাথ কুমারিদের কাছে। তারা যেতে যেতে ফিরে দেখে সেই মুক্তার আদিবাসী এলাকা। কি করে একজন প্রিয় বন্ধু সঙ্গ ছেড়ে বিদায় নেবে, কিন্তু না গিয়ে উপায়।।

(প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার' গল্পের অনুকরণে)

THE MORE THE MERRIER: ON THE IMPORTANCE OF READING BOOKS OUTSIDE THE SYLLABUS

Debaditya Mukhopadhyay
Asst. Prof., Department of English

This brief piece is chiefly addressed to the students of literature in general and English literature in particular. You have your syllabus, your suggestions that feature dozens of questions. Then there are the worries about History of Literature, which even in its shortened form, that is H.E.L. sounds quite close to the opposite of heaven. Yet I would be requesting and suggesting that you read more. By asking to read more, I do not simply ask you to read the texts, the topics included in your syllabus, I am talking about moving beyond it.

Barring a few exceptional cases, literature was written for entertaining readers. Though it is very difficult to imagine, readers did wait for the release of their favourite author's next book or next instalment of the same story with great enthusiasm, just like they do for the release of an awaited movie by a Superstar. In fact, during the time of the release of Harry Potter novels, especially its last part, a wide celebration and excitement was noted. Trust me, throughout the History of Literature written in English, you will find the name of several other gems like it. Problem is, a reluctance to make attempts to enter this endless world of literature controls most of the young minds at present.

Yes, even our generation had its distractions. We did waste a lot of time doing things that were not so important and I completely agree that doing these unimportant things is also important but what I request is, do not let literature lose importance in your life. You can go on neglecting literature and despite the neglect of many, literature will still be what it is but you will deprive yourself from things your one single life will probably not give you a chance to learn about.

Sadly, students of literature especially have started developing a tendency to simply avoid reading literature outside their syllabus. Students of other discipline often envy us for our opportunity to read Shakespeare, Tagore, Jibananda but with great regret I will have to admit that students of literature often consider these names as their worst nightmares. Yes, the Honours or Pass courses in Literature do often create situations which create boredom, especially during the examinations but those moments should not be allowed to make us allergic to literature. Besides, there is a logic that misguides many, that is, since we are reading two plays, three novels, ten poems, we simply do not need to read more. What is in the

syllabus is there because they are important and therefore, what is not there must not be important at all! Believe me, there is nothing faultier than this logic I mentioned.

A University does not design a syllabus for giving students the list of the only important texts; it does so for guiding them towards the vast, endless world. Besides, a syllabus generally features texts for everyone; they do not offer you texts of your choice exclusively. *Macbeth* has to be in the syllabus for representing the essence of Shakespearean Tragedies but *Hamlet* might speak to you more. You might feel a little bored by Tagore's *Gora* but you might also get to laugh heartily when reading his short stories or shed tears for imaginary characters when reading stories like "Kabuliwala".

Anyone can read literature if he or she knows the language but a student of literature is supposed to get trained during graduation or post-graduation courses for appreciating literature in a better way. All those lessons can be put to use only if you read new texts. Texts in your syllabus have already been used for teaching you the methods of appreciation and now if you really want to apply your knowledge, pick a new text, of your choice. Yes, you will not be able to finish reading everything but you will be sharing the experiences of all those characters you will meet and that will definitely help you understand life a little more.

PATRIOTISM
An Important Weapon to Develop a Nation

Sujit Ghosh
Guest Teacher

Patriotism is the ideology of attachment of homeland. This attachment can be viewed in terms of different features relating to one's homeland, including ethnic, cultural, political or historical aspects. It encompasses a set of concepts closely related to those of nationalism.

Patriotism is not only a feeling of a nation or a country, it is always a practical feeling for the nations. It is an actual feeling of an individual to create something which is helpful for all people of a country.

The feeling of patriotism is important for the freedom of a country. A patriotic person will always be ready to sacrifice his life for the love of his country. Only a good patriotic man can do many things for his country or nation. Patriotism is one of the best virtues of men. It is noble feeling of mind. It is said that mother and motherland are superior to heaven. Most man have got a love for their country. They wish to make their native land free. Some good of the country. A selfish man does not love his native country. A selfish man may be rich, he may be born in a noble family, he may have a big title, but nobody respects him. After his death, he is forgotten by all. He is sometimes an enemy to the country. He seeks his own interest. He can even do harm to the country for his own interest. But everybody praises a patriot. A patriot is immortal and he is worshiped by his own countrymen. He is honoured all over the world. Everyone of us knows Netaji Subhas Chandra Bose, Aurobinda Ghosh, Khudiram Bose and Swami Vivekananda and Rabindranath Tagore. They sacrificed everything for the freedom of their country. They won the hearts of their countrymen.

Nation building is a process to help a nation to develop into a good country where all the people will enjoy equal opportunity in respect of their own activities.

Nation building mostly depend on the people of the nations who are always ready to fight or sacrifice themselves for their country. It is an attachment to the nation as well as systems and resources of this nation. When a person develops properly, he realizes his duties and responsibilities for his own nation at all moment.

Actual nation building is possible when all the individuals feel what their own activity and their responsibility and fully complete their actual work which is helpful to the others, who need a help to survive in proper way.

Patriotism and nation building are closely related to each other. Nation building depends on the nations social, economic, cultural, political and moral conditions. A nation is popularized then. When all the persons of a nation are truly patriots and patriotism is a strong weapon for the development of a nation.

The Monster in Love

Abhijit Roy
English Hons., 1st Year

How was Sami going ever to believe that his anger and Fury would one day disappear? This is the story of how Sami, the evil monster everything began when sami was on his way to turn ready to carry out his plan of scaring all the children there. The town, called vill. Was situated on a high hill in the Forest, on the other side of the river.

Mummy

Marium Khatun
2nd Year, English

You cuddle me when I am fearful
You comfort me when I am tearful
You take me to exciting places
You make me laugh with silly faces.
You celebrate each milestone new,
You put me first in all you do
You watch me as I sleep at night,
You keep me safe with all you, might
You know the things I like and need
You find me toys and books to read.
You make me smile, you are kind and funny
And that is why I love you Mummy.

Friendship

Samima Khatun
1st Year, English Hons

True friendship
Like a garden, grows
From such a tiny seed,
That's planted first with love.

True friendship is
Like kindness
And care.
That's sublime
Like morning pray.
True friendship is
Like flowers that blooms
And spreads its fragrance
Throughout the world.

True friendship
Makes life colourful,
With happiness and joy.

True friendship
Makes one feel strong,
Through thick and thin,
With braveness.

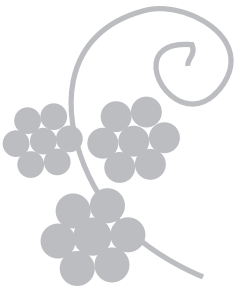

The Ghost

Rumana Aktar
2nd Year, English

Peace in thy hands,
Peace in thine eyes,
Peace on thy brow,
Flower of a moment in the eternal hour,
Peace with you now.

Not a wave breaks,
Not a word
Not a bird calls,
My heart, like a sea,
Silent after a storm that hath died,
Sleeps within me.

All the night's dews,
All the world's leaves,
All winter's snow
Seem with their quite to have stilled in life.
All sorrowing now.

The Cruel Monster & The Villager's Story

Sk. Saniul
2nd Year, English

Once upon a time a monster lived in a big castle in a dense forest. The forest was situated beside a village, Full of human habitation. The monster was a very wicked one. Every night he went out of his castle and went to the village. Then, he began to kill all the domestic animals. They did not even understand that a monster come to their village and kill their domestic pets. One day the villagers decided to catch the criminal who was killing their animals. That night most of the villagers did not sleep and remained alert to catch the culprit. When dead night descended on the bosom of the village the monster with his huge physique set his foot on the village. All noticed to their astonishment the huge creature. He came and plundered and killed and ate many animals. Seeing him all were stricken with great panic. Yet they gathered courage and hurled stones and arrows to the monster. But their efforts reduced to nothingness. The huge creature ransacked the entire village and returned to his castle. To get relief from the torture of the monster the villagers went to a hermit and requested him, "O Lord! Please save us from this dangerous creature." The hermit said, "Oh, my sons I think there is a solution to this problem. Attack the castle of the Monster in the forest in the broad day light. He cannot see at day time. Enter his cattle and you will see a golden parrot in a cage. The parrot is the heart of the monster. Kill the parrot and cut it into pieces. The monster will die then. The villagers obeyed the hermit. They attacked the castle and killed the golden bird to pieces. The monster died at once. The villagers heaved a sigh of relief and were saved from his cruel clutch. Thereafter, they began to live in peace.

Moral : A tyrant has a sure ruin.

Monsters in Everyday Life

Shreyasi Singha
2nd Year, English

Monsters are everywhere in this world. Everyone, at least once in their life must have met a monster. Some of us realized that and some of us not. Even we are carrying those elements of monsters within ourselves knowingly or unknowingly. Now, the question is what it takes to be a monster?

Different people have different opinions about monster but the one thing is always common in their opinion that monsters are cruel. Exactly, 'cruelty' is the real monster. Now the next question can be like – 'Do they / monsters look like human?' Of course, they do look like human even they are also human being. So, what makes the difference between a normal human being and a monster? The answer is – 'humanity'. They don't have humanity and that makes the difference.

If I pen down the examples about monsters who are with us in our life then it would be easier to understand – i) After a whole day's hard work your boss gets mad at you and tell you to get out, you can definitely find the monster's element in him. ii) When the teacher punishes you without any reason – then he / she is a monster to you. iii) Your servant is working from day to night without complaining about anything and after long day's work when he / she ask you for some food, you ignore him or you show your anger towards him – there must be a monster living within you. iv) Every terrorist is a monster. They have got same qualities like a monster have cruelty, less humanity / no humanity, no sense of innocence.

So, as we can see monsters are everywhere in every section of our life. Some people even can consider a person as monster simply because he/she is not handsome. These people have the wrong concept.

We need to find out those monsters who are living within us. Monsters are not from another world. Anyone can be a monster if he lost his mankind / humanity.

A Terrible Dream

Mehrun Nesha
2nd Year, English

Fear is one of the greatest emotions that stays with us forever. The fears of monsters will always be in their heights, colours, dresses, flying, loneliness and shapes etc. As mentioned the best monsters are those that could actually exist as Stella. As children, we all believe in ghouls, vampires, monsters. I have been written a short story based on this very fact and I believe it fully – a story of fear as though it were a living entity that feeds on the fears of others.

It is my one of the passed nights. The time was about 9 O'clock at night. My physical condition was not better. I felt illness so I went to bed and fall asleep. I see a shadow and I rise from bed just thinking it, as son as my feet will be kept on the ground from the bed, I noticed that the shadow is gradually forwarding towards me.

The shadow was about 7 feet tall as if it minds that his head will touch the upper shelves of my room. In fact, he was wearing a long and deep black dress from head to toe. From the neck down it looked like a human body. But in his face, his eyes were not only big but also the colour of his eyes were red and if situated in such a way that the eyes will be picked up. His cheek was full of scratches, old and new. He had two out from the both sides of his nose that looked like an arch. There were also big and sharp nails in his fingers of his hands.

To see this ugly, gruesome. And evil shape, I am crying, shouting again and again and said – 'Who are you? What do you want from me? Who are you? What do you want?

But the shadow does not give any answers of my questions, instead he gradually advanced to me.

In this moment, I woke up from my sleep and straightly sat on my bed. I sighed for a smile. I placed my hands my hands over my heart and found its wall still breathing. Then watched my room properly with fear but I did not see anything else such as the shadow. Then I realized that it is just a terrible dream.

The Old Lady and A Doctor

Indrani Mandal
1st Year, English

Once upon a time there lived an old and rich lady. One day she became blind and called in a doctor. Then, the doctor examined her thoroughly and demanded a huge amount of fees for her treatment. The lady agreed to pay a large amount of fees if she cured. Then, the doctor started her treatment. But, the doctor was greedy for the blind lady's furniture. So, he daily came her house and stole some of her furniture. At last, the doctor completely cured the lady and wanted his fees. But, she refused to pay his fees saying that she was not completely cured. Then, they went to court. The judge heard the doctor's complaint. Then, he said to the lady, "Why don't you pay the fees?" Then, the lady said, "I am not quite cured, Sir. I cannot see most of my valuable furniture in the house." At last, the judge understands the matter and gave his verdict in favour of the old lady.

Moral : Dishonesty never pays in the long run.

A Fearful Night

Mouli Karmakar
1st Year, English

'Mum, is that you?" I said while I walking towards our kitchen. Then I turned my head towards our living room and I frozen out of fear. I saw a figure not very visible enough but he was wearing pink T-shirt. When I looked and looked again at the strange figure it was not there, it had disappeared. I was too frightened after this incident. Then, I saw mom, she was getting ready to go to work. But as I frightened I didn't wanted to stay alone at home. "Can I come with you?" I asked mom when she was about to leave for her work. She said, "Oh son, you will feel bored." She promised that see will come home early, so I can't go out. She also promised me while she was putting some foods in her bag. But as I was too frightened. I can't stay at home alone. But mom advised me to invite my friends in my home. Unfortunately I stay at home alone. Then I thought of having some food. Then I felt warmth behind my neck and I turned. No one was seen behind me. I shrugged when I heard the door creak stopping and again. I was afraid to go and see what it was. But I prepared my head to see what it was. The door is open I locked it. When I turned that figure was standing in front of me, smiling. Now he was clear enough to see. "Who are you?" I asked not knowing what should wrong happen with me. The mysterious figure replied that he was Draculla. After listening that I wanted to run away but after the incident, I forgot my way and I was lost. My legs stopped working and my head also. The strange figure laughed in a high-pitched voice. And the ghost wanted to kill me. Then I made a noise and I found myself in the bed. I am still dreaming on my bed and my mother would come back home. She bought some story books for me.

MOVIE REVIEW : TUMBBAD

Shreyasi Singha
2nd Year, English

Tumbbad is hauntingly beautiful. The story of the film is related to Indian Mythology. The moment you'll start watching the film you'll find out a strong connection with your childhood tales; which you might have heard from your grandparents. The main aspect of the film is a story that has been told for decades. The Goddess of prosperity giving birth to sixteen crores Gods and Goddesses and Hastar was the first child. The earth was womb and Hastar had ill intensions. The God has endless reserves of golds and grains. Hastar was allowed to possess only gold, but greedy Hastar went to get the grains too, when God and Goddess got to know about this they wedge a wear against him. The Goddess however protected him in the womb. Hastar was cursed with a curse that he'll never be worshiped. Now the story turns out to be how the curse of this forbidden God acts as boon to a brahmin family in the village of Tumbbad headed by Sohum Shahcreates a magic in the screen.

The world of Tumbbad is something which you cannot connect with the real world. The world of space but still it'll give you a feeling of nothingness. The constant rain, the uses of colours like – blue, grey, red and gold helped to set up the dark theme and wonderfully created the horrific element. The pre-independence era and the character development at Sohum Shah aka Vinayak portrayed beautifully.

The background score is surely a masterpiece. Tumbbad is horror and fantasy but the film also works as a grim morality tale, definitely a life lesson. Directors Rahi Anil Bahove and Adesh Prasad showcased a morality tale in a ghastly manner with powerful visualization. I don't evenlearn to start with the performances of the actors – They're phenomenal. Don't know if it was the good direction of production of the performance but I sequel literally couldn't get up or intended to, even after the movie was over. Eagerly waiting for the sequel of Tumbbad. Tumbbad fulfilled the marketing strategy of promoting things with a tagline – "You've never seen anything like this before".

MANIKCHAK COLLEGE

OVERALL ACTIVITY 2018-19

Sl. No.	Date	Activities
1	05.09.2018	Teachers' Day Celebration
2	24.09.2018	Seminar on "Rabindranath ebong Lokosanskriti" organized by Department of Bengali
3	05.10.2018	Safe Drive Save Life, organized by NSS Unit, Manikchak College
4	12.10.2018	Seminar on Career Counselling for WBCS, Rail, Banking etc. organized by Career Counselling Unit
5	18-19.11.18	Freshers and Cultural Programme
6	05.12.2018	Field Trip, organized Department of Bengali, English and Sanskrit
7	14.12.2018	Campus Cleaning Program, organized by NSS Unit, Manikchak College
8	14.12.2018	Special Lecture on "Nineteenth Century English Literature" by Prof. Chidananda Bhattacharya organized by Department of English
9	02.01.2019	Special Lecture on "bangla Sahityer" by basudeb Sarkar organized by Department of Bengali
10	11.01.2019	Annnual Sports
11	24.01.2019	Special Lecture on "Education" organized by Department of Education
12	29 - 31.01.19	DPI Sports
13	30.01.2019	Special Lecture on "Netaji : the forgotten Hero" by Prof. Anil Kr. Sarkar organized by Department of History
14	01.02.2019	Field Trip, organized Department of History, Political Science, Education, Philosophy and Sociology
15	14.02-01.03.19	Test Examination, 2019
16	08.03.2019	Applied for 2(f) and 12(b) to UGC
17	09 & 19.03.19	Test Result Publication of Honours and General Course respectively
18	13. 03.2019	Stakeholders' Meet - I
19	18.03.2019	Seminar on "Sikorer Kathamala" organized by Career Counselling Unit
20	26.03.2019	2nd Issue of Departmental Wall magazine "VISTAS" published by Department of English
21	05.04.2019	Special Lecture on "Rabindranath O Sahitya" by Prof. Dipak Chandra barman and Prof. Biswajit Roy organized by Department of Bengali
22	09.04.2019	Departmental Students' Seminar organised by Department of English
23	10.04.2019	Stakeholders' Meet - 2
24	11.04.2019	Blood Donation Camp organized by NSS Unit

MANIKCHAK COLLEGE

DATA SHEET OF SCHOLARSHIPS (2018-19)

Name of Scholarship	UR		SC		ST		OBC-A		OBC-B		PH		TOTAL	
	Total	Female	Total	Female	Total	Female	Total	Female	Total	Female	Total	Female	Total	Female
Kanyashree Prakalpa	123	123	68	68	0	0	12	12	24	24	0	0	227	227
Swami Vivekananda Merit-Cum-Means	17	4	5	0	0	0	0	0	4	1	0	0	26	5
Swami Vivekananda Merit-Cum-Means for Minority	37	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	12
Post Matric Scolarship for SC/ST/OBC	0	0	955	425	1	1	300	141	86	40	0	0	1342	607
National Scholarship	405	238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405	238
Talent Support Scholarship	447	211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	447	211
Chief Minister Relief Fund Scholarship	35	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	19

MANIKCHAK COLLEGE

FACILITIES

Library
Canteen
Boys' Hostel
Girls' Hostel
Smart Classroom
Seminar Room
Play Ground
Net Access
Sports Supports
Computer Lab
Reading Room
Wifi
Purified drinking Water
Parking Zone
CCTV surveillance
Career Corner

FUTURE PLAN

UGC 2(f) and 12 (B)
NAAC
Opening of Science stream

NEW SUBJECTS
Physical Education, Economics
Geography, Defense Studies

NEW HONOURS
Sociology, Philosophy, Arabic

PG Course
Auditorium
Ensure 100% Students Attendance
Digital Library
Creation of more teaching and non teaching post
Paperless Office
100% Cashless Transaction
NCC
Research

ACTIVITY(S)

Seminar : National, International
Workshop
Career Counseling
Special Lectures

NSS
Blood donation camp, Awareness Program,
Safe Drive Save Life, Campus Cleaning etc

Interaction with Stakeholders
Educational Tour
Field Trip Students' Seminar Cultural Program,
Wall Magazine, Institutional Magazine

মানিকচক কলেজ
রক্তদান শিবির
NSS শাখা
মানিকচক কলেজ
মানিকচক কলেজ
NSS UNIT
মথুরাপুর, মালদা
SAFE DRIVE SAVE LIFE
FRESHERS' WE...OME & AN...
18 & 19
...rd Year

MANIKCHAK COLLEGE

Mathurapur, Malda - 732293, West Bengal

Contact 03513 283048 ; Email manikchakcollege@gmail.com

Website : www.manikchakcollege.com